স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী

৫ম বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা ❑ জুন-জুলাই ২০১৬

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে, গোপাল সরকার, দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া,
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন : ২২৫২-৭৮১৬ / ৩৭০৯ / ৯১৬৭

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

নিষিদ্ধ ওষুধ: জানুন আর জানান

এই সেদিন সরকার ৩৩৭ ধরনের ওষুধ নিষিদ্ধ করেছেন। অভিজ্ঞতা বলে, নিষেধাজ্ঞা জারি করার পরেও এই ওষুধগুলো আপনাকে খাওয়ানো হবে। যেহেতু এগুলো খেলে আপনার ক্ষতি, তাই আপনাকেই জেনে নিতে হবে কোন ওষুধ কী কারণে এবারে নিষিদ্ধ হল । লিখেছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

৪

এপিস্ট্যাক্সিস—নাক থেকে রক্তপাত: রোগ না উপসর্গ?

রাতবিরেতে হঠাৎ নাক থেকে রক্তপাত হওয়ার ফলে হাসপাতালে ছুটোছুটি করার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। অত্যন্ত ভয় পাওয়ানো এই উপসর্গের কারণ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে কাজের কথাগুলো বলেছেন **ডা. সোনিয়া বেগম**।

১৪

বেডসোর

বাড়ির কেউ শয্যাশায়ী? বেডসোর-এর আতঙ্কে ভুগছেন? বেডসোর হয়ে গেলে চিকিৎসা কঠিন, প্রাণসংশয়ও হতে পারে। কিন্তু বেডসোর ঠেকাতে আপনি নিজেই অনেক কিছু করতে পারেন। বাড়িতে বা হাসপাতালে সাধারণ যত্ন, রোগীকে সময়মতো পাশ ফেরানো—এসব দিয়েই প্রায় সব ক্ষেত্রে বেডসোর আটকানো যায়। লিখেছেন **ডা. জয়ন্ত দাস**।

১৭

সোশ্যাল মিডিয়া

ফেসবুক ট্যুইটার এসব নিয়ে তৈরি এক অদ্ভুত ইচ্ছেপূরণ-অপূরণের কল্পজগৎ। সেখান থেকে বন্ধু হয়, ছদ্মবন্ধু হয়, নানা সুশিক্ষা হয় আবার হরেকরকম কুশিক্ষাও হয়। এর ওপর আবার রয়েছে ফেসবুক অ্যাডিকশন ইত্যাদি সমস্যা। তা বলে কি একে একেবারে এড়িয়ে চলবেন? তাও নয়—লিখেছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য**।

৪৬

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবেই সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

নিষিদ্ধ ওষুধ: জানুন আর জানান — ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৪

এপিস্ট্যাক্সিস—নাক থেকে রক্তপাত: রোগ না উপসর্গ — ডা. সোনিয়া বেগম ১৪

বেডসোর — ডা. জয়ন্ত দাস ১৭

রিপোর্ট: জলাশয় ও পরিবেশ রক্ষায় সাইকেল র‍্যালি : জলা বাঁচাও, জমি বাঁচাও, গাছ বাঁচাও ২৪

চায় পে চর্চা — ডা. আশীষ কুমার কুণ্ডু ২৫

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তাকে মনে রেখে — মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন ২৭

মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য — ডা. পুণ্যব্রত গুণ ২৮

ডা. হৈমবতী সেনের দিনলিপি থেকে — প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ৩২

ভুলে যাওয়ার যন্ত্রণা। ভুলতে দেখার যন্ত্রণা। মেয়েদের কথা ভাবে কে? — শ্রী মুখোপাধ্যায় ৩৬

বাচ্চার সর্দিকাশি — ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে ৩৮

হাঁপানি — ডা. কুশল সেন ৪১

স্মরণে — ডা. সুব্রত মৈত্র ৪৪

সোশ্যাল মিডিয়া: আধুনিক মননে তার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল — রুমঝুম ভট্টাচার্য ৪৬

বড়ো হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ-— সরকারি কর্মচারীদের হয়রানি — ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী ৪৯

বিপর্যয়ের মুখোমুখি ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা — ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ৫১

বই পড়া — স্বাস্থ্যের উৎস সন্ধানে — ডা. জয়ন্ত দাস ৫৫

টুকরো খবর

- ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন নিষিদ্ধ করার পক্ষে ভারতের ত্বক রোগ বিশেষজ্ঞরা ১৩
- নিরামিষ খাদ্য ভালো, কিন্তু সুষম খাদ্যই স্বাস্থ্যকর ৪৫
- যেকোনো দাতার কাছ থেকে নেওয়া কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব ৫৪

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭,
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল, (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৪৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম(মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-র গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No.0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

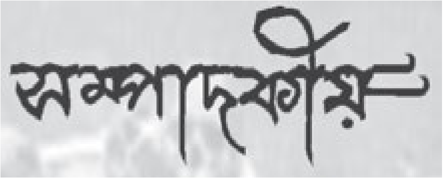

নিষিদ্ধ ওষুধ

ভারত সরকার সম্প্রতি এক অধ্যাদেশবলে ৩৩৭টি ওষুধকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। আমাদের জেনে নেওয়া দরকার কোন কোন ওষুধগুলোকে নিষিদ্ধ করা হল, কেননা, আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বলে, নিষেধাজ্ঞা জারি করার পরেও বেশ কিছুদিন ধরে কিছু ডাক্তার সেই ওষুধগুলো লিখবেন, প্রায় সব ওষুধের দোকানে সেইসব ওষুধ বেচা হবে, এবং ওষুধ কোম্পানিগুলোও সেইসব ওষুধ বাজার থেকে তুলতে খুব তৎপর হবে না। সরকার সাধারণত নিষেধাজ্ঞা জারি করেই খালাস, ডাক্তারদের কাছে বা ওষুধের দোকানগুলোতে নিষিদ্ধ ওষুধের কোনো সরকারি লিস্ট যায় না। প্রস্তুতকারক কোম্পানির কাছে একটি নোটিশ যাবার কথা, কিন্তু তৈরি করে রাখা ওষুধ, তা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো হোক আর না হোক, ফেলে দেওয়াটা কোম্পানির স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, তাই নানারকম খেলা চলতে থাকে। সুতরাং পাঠকদের নিজ স্বার্থে জেনে নেওয়া ভালো এবারের তালিকায় নিষিদ্ধ হল কোন ওষুধগুলো। সেটাই এবার *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র প্রধান প্রচ্ছদ নিবন্ধ।

একটু টেকনিক্যাল কথা না বললে এবারের নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকাটা পাঠকদের কাছে কিঞ্চিৎ ধোঁয়াশা ঠেকতে পারে। এবারে নিষিদ্ধ হয়েছে কোনো একটি ওষুধ নয়, বরং নানা ওষুধ মিশিয়ে তৈরি করা কিছু ওষুধমিশ্রণ। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই মিশ্রণগুলোর এমনিতেই কোনো বৈধতা নেই, কেন যে এগুলো আদৌ ওষুধ হিসেবে ভারতবাসীকে দেবার প্রথম অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, সেই উত্তরটা এদেশের ওষুধ-নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্তারা দিতে পারবেন বলে বোধ হয় না।

আমাদের অনেকের ধারণা আছে, ওষুধ যেহেতু মানুষের মরা-বাঁচার ব্যাপার, ওষুধ কোম্পানিগুলো এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। তারা তেমন ওষুধই তৈরি করে যা মানুষের ভালো করে। গুটিকয় 'খারাপ' কোম্পানি হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু অন্তত বড়ো বড়ো খানদানি ওষুধ কোম্পানিগুলো মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ। কথাটা শুনতে ভালো, সত্যি হলে খুব ভালোই হত, কিন্তু দুঃখের বিষয় যেকোনো কোম্পানির মতো ওষুধ কোম্পানিরও টিকে থাকার একটাই কারণ—মুনাফা, মুনাফা, আরও মুনাফা। জুতোর কোম্পানিই হোক আর ওষুধের কোম্পানি, মুনাফা কম হলে শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের কাছে জবাবদিহি চাইবেন, উপযুক্ত জবাব না পেলে ম্যানেজার বদলে এমন ম্যানেজার আনবেন যারা বেশি লাভ করতে পারবে। কী করে লাভ করা হচ্ছে, জুতোর কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার সেটা দেখেন না, ওষুধ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারও সেটা দেখেন না। দেখলেই সেটা অবাক কাণ্ড বলতে হত, কেননা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুনাফাই শেষ কথা বলে, মুনাফা না করতে পারলে সে কোম্পানি শেষমেষ উঠে যায়।

কিন্তু জুতোজামার সঙ্গে ওষুধের একটা মৌলিক তফাত আছে। সেটা কী? তফাতটা এই যে জুতোজামা ধরনের সব জিনিস কেনার ব্যাপারে ক্রেতা নিজেই সিদ্ধান্ত নেন, যদিও নানাধরনের বিজ্ঞাপন ও সামাজিক স্রোত তাঁকে প্রভাবিত করে। কিন্তু ওষুধের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একদম আলাদা। এখানে যাঁর পকেট থেকে পয়সা যাচ্ছে, সঙ্গত কারণেই তিনি নিজের ওষুধ খাবার সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারেন না। তাঁর হয়ে সিদ্ধান্ত নেন ডাক্তাররা, এবং আমাদের দেশে ডাক্তারদের স্থান দখল করে বসা পাশ-না-করা ডাক্তার, ওষুধের দোকানি, এমনকী পাড়ার দাদারাও। কিন্তু পাশ-করা ডাক্তারদের মূলধারার প্রেসক্রিপশন দ্বারাই দোকানদার বা পাশ-না-করা ডাক্তার ইত্যাদিরা প্রভাবিত হন।

ফলে মুনাফা যদি বেশি হয়, ওষুধ কোম্পানি বেঠিক ওষুধ তৈরি করে বিক্রি করতেই পারে, খালি নানাধরনের ডাক্তারদের ম্যানেজ করতে হয়। সেটা কীভাবে তারা করে সে-বৃত্তান্ত আরেক মহাভারত। বলার কথা এইটাই যে একটা বড়ো অংশ কমবেশি ম্যানেজ হয়ে যান, নইলে এতগুলো অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক ওষুধ বাজারে চলত না, মাঝেমধ্যে সরকার বাহাদুরকেও নানান কারণে ও চাপে ওষুধগুলো নিষিদ্ধ করার কাজটা করতে হত না; ভুল ওষুধ বিক্রিই হত না বাজারে।

অতএব, আপনার স্বার্থ দেখেই ওষুধ তৈরি হচ্ছে, আপনার রোগ সারানোর জন্যই কেবলমাত্র ওষুধ লেখা হচ্ছে, এমন ধারণা যদি থেকে থাকে, তাহলে আপনি এখনও বাজারের 'ন্যায়-নিয়ম' জানেন না। সেই 'ন্যায়'-এর গুঁতো থেকে বাঁচতে হলে 'নিষিদ্ধ' ওষুধগুলো আপনাকেও জানতে হবে। বা বলা ভালো, আপনাকেই জানতে হবে।

নিষিদ্ধ ওষুধ: জানুন আর জানান

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ৩৩৭ ধরনের ওষুধ নিষিদ্ধ করেছে। কেন নিষিদ্ধ করা হল? আর কেনই-বা সেই ওষুধগুলোর বিষয়ে সাধারণ মানুষেরও জানা দরকার? লিখছেন ডা. পুণ্যব্রত গুণ।

ভারতে প্রথম কয়েক ধরনের ক্ষতিকর ওষুধ নিষিদ্ধ হয় ১৯৮৩ সালে। ঠিক তার আগের বছর প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ নিষিদ্ধ করেছে ১০৯৯টা ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় ওষুধ, ঘোষণা করা হয়েছে ১৪৬টা নিষিদ্ধ হবে এক বছর পর থেকে। ভারতেও আওয়াজ উঠতে শুরু হয়েছে ‘মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ’। ১৯৮৩-র ২৩ জুলাই ভারতের ওষুধ মহানিয়ন্ত্রকের দপ্তর ১২ ধরনের ক্ষতিকর ওষুধ নিষিদ্ধ করে। ১৯৮৩ থেকে ২০১২-র ৬ জুন অবধি নিষিদ্ধ ওষুধের সংখ্যা ছিল ৯১। সম্প্রতি, ২০১৬-র ১০ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ৩৪৪ ধরনের ওষুধ নিষিদ্ধ করেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে কিন্তু আমরা ৩৩৭ ধরনের ওষুধের নাম খুঁজে পেয়েছি, কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি উধাও।

এবারের বিশেষত্ব হল নিষিদ্ধ ওষুধগুলির সবগুলিই fixed dose combination অর্থাৎ একাধিক ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ।

নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ ওষুধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক, কেননা—

- এক্ষেত্রে একটা ওষুধের মাত্রা অপরিবর্তিত রেখে অন্যটার মাত্রা কমানো বাড়ানো যায় না।
- মিশ্রণের উপাদান-ওষুধগুলো আলাদা আলাদা কিনলে যা দাম পড়ে, সাধারণত মিশ্রণ ওষুধের দাম তার চেয়ে বেশি হয়।
- দেখা গেছে উপাদানগুলোর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশি হয় নির্দিষ্ট মাত্রার মিশ্রণ ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

২০১০-এ হেলথ অ্যাকশন ইন্টারন্যাশানাল (HAI)-এর অর্থানুকূল্যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মেডিসিনাল ইউনিট (CDMU) ভারতের বাজারে অযৌক্তিক মিশ্রণ ওষুধের ওপর এক সমীক্ষা চালায়। দেখা যায়—২০০৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের ওষুধ-মহানিয়ন্ত্রক বাজারে চলা ২৯০ রকমের মিশ্রণ ওষুধকে অনুমোদনহীন ঘোষণা করেন। এই মিশ্রণগুলো বিভিন্ন রাজ্যের ওষুধ-নিয়ন্ত্রকের ছাড়পত্র পেয়ে বাজারে ছিল। (আমাদের দেশে যেকোনো রাজ্যের ওষুধ-নিয়ন্ত্রকের কাছ থেকে যেকোনো উপায়ে লাইসেন্স পাওয়া থাকলেই অন্য রাজ্যগুলোতে ওষুধ বিক্রি করা যায়)। নিষেধাজ্ঞার পর ওষুধ-কোম্পানিগুলো নিজ নিজ মিশ্র ওষুধের অনুমোদন ফিরে পাওয়ার জন্য ক্ষমতার অলিন্দে দৌড়োদৌড়ি শুরু করে, আদালতে কিছু মামলা দায়ের করা হয়। ২৯০টার মধ্যে ১৭৫টা অনুমোদন ফিরে পায়, অনুমোদনহীন থেকে যায় ১১৫টা মিশ্রণ। সমীক্ষায় দেখা যায় সেই ১১৫টার মধ্যে ৫০টা তখনও নানা ব্র্যান্ড নামে বাজারে বিকোচ্ছে।

এবার যে মিশ্রণ ওষুধগুলি নিষিদ্ধ হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে মানুষজনকে জানাতে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের কারিগরি সহযোগিতায় কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মেডিসিনাল ইউনিট একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে—Know The Banned Drugs।

এই পুস্তিকায় নিষিদ্ধ ওষুধগুলিকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে নিষিদ্ধ ওষুধগুলির মধ্যে:

১. জ্বর-ব্যথা বা অ-স্টেরয়েড প্রদাহরোধী ওষুধ মিশ্রণ ৩০টি
২. সর্দি-কাশির ওষুধ বলে প্রচলিত মিশ্রণ ১৬১টি
৩. অ্যান্টিবায়োটিকের মিশ্রণ ৩৫টি
৪. ডায়াবেটিসের মুখে খাওয়ার ওষুধের মিশ্রণ ২৭টি
৫. উচ্চরক্তচাপের ওষুধের মিশ্রণ ৩টি
৬. পেপটিক আলসারের ওষুধ মিশ্রণ ১৫টি
৭. মনোরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ মিশ্রণ ৫টি
৮. অন্যান্য ওষুধ মিশ্রণ ৬০টি

জ্বর-ব্যথা বা অ-স্টেরয়েড প্রদাহরোধী ওষুধ মিশ্রণ

ওষুধ মিশ্রণের নামের আগে বসানো ইংরাজি অক্ষরগুলো (যেমন S.O.705(E) ইত্যাদি) সরকারি আদেশনামার ক্রমিক সংখ্যা বোঝায়।

1. S.O. 705(E) Aceclofenac + Paracetamol + Rabeprazole
2. S.O. 706(E) Nimesulide + Diclofenac
3. S.O. 708(E) Nimesulide + Tizanidine
4. S.O. 710(E) Diclofenac + Tramadol+ Chlorzoxazone
5. S.O. 712(E) Nimesulide + Paracetamol
6. S.O. 714(E) Diclofenac + Tramadol + Paracetamol
7. S.O. 715(E) Diclofenac + Paracetamol + Chlorzoxazone + Famotidine

8. S.O. 716(E) Naproxen + Paracetamol
9. S.O. 717(E) Nimesulide + Serratiopeptidase
10. S.O. 718(E) Paracetamol + Diclofenac + Famotidine
11. S.O. 719(E) Nimesulide + Pitofenone + Fenpiverinium + Benzyl Alcohol
12. S.O. 720(E) Omeprazole + Paracetamol + Diclofenac
13. S.O. 721(E) Nimesulide + Paracetamol injection
14. S.O. 724(E) Diclofenac + Zinc Carnosine
15. S.O. 727(E) Phenylbutazone +Sodium Salicylate
16. S.O. 728(E) Lornoxicam + Paracetamol + Trypsin
17. S.O. 729(E) Paracetamol + Mefenamic Acid + Ranitidine + Dicyclomine
18. S.O. 730(E) Nimesulide + Dicyclomine
19. S.O. 731(E) Heparin + Diclofenac
20. S.O. 733(E) Paracetamol + Tapentadol
21. S.O. 736(E) Lornoxicam + Paracetamol + Tramadol
22. S.O. 737(E) Lornoxicam + Paracetamol + Serratiopeptidase
23. S.O. 738(E) Diclofenac + Paracetamol + Magnesium Trisilicate
24. S.O. 742(E) Serratiopeptidase (enteric coated 20000 units) + Diclofenac Potassium & 2 tablets of Doxycycline
25. S.O. 743(E) Nimesulide + Paracetamol Suspension
26. S.O. 744(E) Aceclofenac + Paracetamol + Famotidine
27. S.O. 745(E) Aceclofenac + Zinc Carnosine
28. S.O. 750(E) Aceclofenac (SR) + Paracetamol
29. S.O. 751(E) Diclofenac + Paracetamol injection
30. S.O. 845(E) Rabeprazole + Diclofenac + Paracetamol

মনে রাখার বিষয় হল ব্যথার সবচেয়ে নিরাপদ ওষুধ কিন্তু প্যারাসিটামল। আর ব্যথার সঙ্গে ফোলা, লাল ভাব, গরম ভাব থাকলে অর্থাৎ প্রদাহ হলে নিরাপদ ওষুধ হল আইবুপ্রোফেন। একসঙ্গে একাধিক ব্যথা কমানোর বা প্রদাহরোধী ওষুধের ব্যবহারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

সর্দি-কাশির ওষুধ বলে প্রচলিত ওষুধ মিশ্রণ

1. S.O. 707(E) Nimesulide + Cetirizine + Caffeine
2. S.O. 709(E) Paracetamol + Cetirizine + Caffeine
3. S.O. 713(E) Paracetamol + Phenylephrine + Caffeine
4. S.O. 723(E) Paracetamol + Phenylephrine + Chlorpheniramine + Dextromethorphan + Caffeine
5. S.O. 725(E) Diclofenac Sodium + Paracetamol + Chlorpheniramine Maleate + Magnesium Trisillicate
6. S.O. 726(E) Paracetamol + Pseudoephedrine + Cetrizine
7. S.O. 740(E) Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Chlorpheniramine Maleate + Menthol
8. S.O. 741(E) Paracetamol + Prochlorperazine Maleate
9. S.O. 746(E) Paracetamol + Disodium Hydrogen Citrate + Caffeine
10. S.O. 747(E) Paracetamol + DL Methionine
11. S.O. 748(E) Disodium Hydrogen Citrate + Paracetamol
12. S.O. 749(E) Paracetamol + Caffeine + Codeine
13. S.O. 859(E) Dextromethorphan + Levocetirizine + Phenylephrine + Zinc
14. S.O. 860(E) Nimesulide + Loratadine + Phenylephrine + Ambroxol
15. S.O. 861(E) Bromhexine + Phenylephrine + Chlorepheniramine Maleate
16. S.O. 862(E) Dextromethorphan + Bromhexine + Guaiphenesin
17. S.O. 863(E) Paracetamol + Loratadine + Phenylephrine + Dextromethorphan + Caffeine
18. S.O. 864(E) Nimesulide + Phenylephrine + Caffeine + Levocetirizine
19. S.O. 866(E) Diphenhydramine + Terpine + Ammonium Chloride + Sodium Chloride + Menthol
20. S.O. 867(E) Nimesulide + Paracetamol + Cetirizine + Phenylephrine
21. S.O. 868(E) Paracetamol + Loratadine + Dextromethophan + Pseudoepheridine + Caffeine
22. S.O. 869(E) Chlorpheniramine Maleate + Dextromethorphan + Dextromethophan + Guaiphenesin + Ammonium Chloride + Menthol
23. S.O. 870(E) Chlorpheniramine Maleate + Ammonium Chloride + Sodium Citrate
24. S.O. 871(E) Cetirizine + Phenylephrine + Paracetamol + Zinc Gluconate
25. S.O. 872(E) Ambroxol+ Guaiphenesin + Ammonium Chloride + Phenylephrine + Chlorpheniramine Maleate + Menthol
26. S.O. 873(E) Dextromethorphen + Bromhexine + Chlorpheniramine Maleate + Guaiphenesin
27. S.O. 874(E) Levocetirizine + Ambroxol + Phenylephrine + Guaiphenesin
28. S.O. 875(E) Dextromethorphan + Chlorpheniramine + Chlorpheniramine Maleate
29. S.O. 876(E) Cetirizine + Ambroxol + Guaiphenesin + Ammonium Chloride + Phenylephrine + Menthol
30. S.O. 877(E) Chlorpheniramine + Phenylephrine + Caffeine
31. S.O. 878(E) Dextromethorphan + Triprolidine + Phenylephrine
32. S.O. 879(E) Terpinhydrate + Dextromethorphan + Menthol
33. S.O. 880(E) Dextromethorphan + Phenylephrine + Zinc Gluconate + Menthol
34. S.O. 881(E) Chlorpheniramine + Codeine + Sodium Citrate + Menthol Syrup

35. S.O. 882(E) Enrofloxacin + Bromhexin
36. S.O. 883(E) Bromhexine + Dextromethorphan + Phenylephrine + Menthol
37. S.O. 885(E) Levocetirizine + Ranitidine
38. S.O. 886(E) Levocetirizine + Phenylephrine + Ambroxol + Guaiphenesin + Paracetamol
39. S.O. 887(E) Cetirizine + Dextromethorphan + Phenylephrine + Zinc Gluconate + Paracetamol + Menthol
40. S.O. 888(E) Paracetamol + Pseudoephedrine + Dextromethorphan + Cetirizine
41. S.O. 889(E) Diphenhydramine + Guaiphenesin + Ammonium Chloride + Bromhexine
42. S.O. 890(E) Chlorpheniramine + Dextromethorphan + Phenylephrine + Paracetamol
43. S.O. 891(E) Dextromethorphen + Promethazine
44. S.O. 892(E) Diethylcabamazine Citrate + Cetirizine + Guaiphenesin
45. S.O. 893(E) Pseudoephedrine + Dextromethorphan + Cetirizine
46. S.O. 894(E) Chlorpheniramine + Phenylephrine + Dextromethophan + Menthol
47. S.O. 895(E) Ambroxol + Terbutaline + Dextromethorphan
48. S.O. 896(E) Dextromethorphan + Chlorpheniramine + Guaiphenesin
49. S.O. 897(E) Terbutaline + Bromhexine + Guaiphenesin + Dextromethorphan
50. S.O. 898(E) Dextromethorphan + Tripolidine + Phenylephirine
51. S.O. 899(E) Paracetamol + Dextromethorphan + Chlorpheniramine
52. S.O. 900(E) Pholcodine + Phenylephrine + Promethazine
53. S.O. 901(E) Codeine + Levocetirizine + Menthol
54. S.O. 902(E) Dextromethorphan + Ambroxol + Guaifenesin + Phenylephrine + Chlorpheniramine
55. S.O. 903(E) Cetirizine + Phenylephrine + Dextromethorphan + Menthol
56. S.O. 905(E) Paracetamol + Phenylephrine + Triprolidine
57. S.O. 906(E) Acetaminophen + Loratadine + Ambroxol + Phenylephrine
58. S.O. 907(E) Cetirizine + Acetaminophen + Dextromethorphan + Phenyephrine + Zinc Gluconate
59. S.O. 908(E) Diphenhydramine + Guaifenesin + Bromhexine + Ammonium Chloride + Menthol
60. S.O. 909(E) Chlopheniramine Maleate + Codeine Syrup
61. S.O. 910(E) Cetirizine + Dextromethorphan + Zinc Gluconate + Menthol
62. S.O. 911(E) Paracetamol + Phenylephrine + Desloratadine + Zinc Gluconate + Ambroxol
63. S.O. 912(E) Levocetirizine + Montelukast + Acebrophylline
64. S.O. 913(E) Dextromethorphan + Phenylephrine + Ammonium Chloride + Menthol
65. S.O. 914(E) Dextromethorphan + Bromhexine + Guaiphenesin + Menthol
66. S.O. 915(E) Acrivastine + Paracetamol + Caffeine + Phenylephrine
67. S.O. 916(E) Naphazoline + Carboxy Methyl Cellulose + Menthol + Camphor + Phenylephrine
68. S.O. 917(E) Dextromethorphan + Cetirizine
69. S.O. 918(E) Nimesulide + Paracetamol + Levocetirizine + Phenylephrine + Caffeine
70. S.O. 919(E) Terbutaline + Ambroxol + Guaiphenesin + Zinc + Menthol
71. S.O. 920(E) Codeine + Chlorpheniramine + Alcohol Syrup
72. S.O. 921(E) Dextromethorphan + Phenylephrine + Guaifenesin + Triprolidine
73. S.O. 922(E) Ammomium Chloride + Bromhexine + Dextromethorphan
74. S.O. 923(E) Diethylcarbamazine + Cetirizine + Ambroxol
75. S.O. 924(E) Ethylmorphine + Noscapine + Chlorpheniramine
76. S.O. 925(E) Cetirizine + Dextromethorphan + Ambroxol
77. S.O. 926(E) Bromhexine + Dextromethorphan + Ammonium Chloride + Menthol
78. S.O. 927(E) Ambroxol + Guaifenesin + Phenylephrine + Chlorpheniramine
79. S.O. 928(E) Paracetamol + Phenylephrine + Chlorpheniramine + Zinc Gluconate
80. S.O. 929(E) Dextromethorphan + Phenylephrine + Cetirizine + Paracetamol + Caffeine
81. S.O. 930(E) Dextromethophan + Chlorpheniramine + Guaifenesin + Ammonium Chloride
82. S.O. 931(E) Levocetirizine + Dextromethorphan + Zinc
83. S.O. 932(E) Paracetamol + Phenylephrine + Levocetirizine + Caffeine
84. S.O. 933(E) Chlorphaniramine + Ammonium Chloride + Sodium Chloride
85. S.O. 934(E) Paracetamol + Dextromethorphan + Bromhexine + Phenylephrine + Diphenhydramine
86. S.O. 935(E) Salbutamol + Bromhexine + Guaiphenesin + Menthol
87. S.O. 936(E) Chlorpheniramine + Ammonium Chloride + Noscapine + Sodium Citrate

88. S.O. 937(E) Cetirizine + Dextromethorphan + Bromhexine + Guaifenesin
89. S.O. 938(E) Diethyl Carbamazine + Chlorpheniramine + Guaifenesin
90. S.O. 939(E) Ketotifen + Cetirizine
91. S.O. 940(E) Terbutaline + Bromhexine + Etofylline
92. S.O. 941(E) Ketotifen + Theophylline
93. S.O. 942(E) Ambroxol + Salbutamol + Theophylline
94. S.O. 943(E) Cetririzine + Nimesulide + Phenylephrine
95. S (E.O. 944) Chlorpheniramine + Phenylephrine + Paracetamol + Zink Gluconate
96. S.O. 945(E) Acetaminophen + Guaifenesin + Dextromethorphan + Chlorpheniramine
97. S.O. 946(E) Cetirizine + Dextromethorphan + Phenylephrine + Tulsi
98. S.O. 947(E) Cetirizine + Phenylephrine + Paracetamol + Ambroxol + Caffeine
99. S.O. 948(E) Guaifenesin + Dextromethorphan
100. S.O. 949(E) Levocetirizine + Paracetamol + Phenylephirine + Caffeine
101. S.O. 950(E) Caffeine + Paracetamol + Phenylephrine + Chlorpheniramine
102. S.O. 951(E) Ketotifen + Levocetrizine
103. S.O. 952(E) Paracetamol + Levocetirizine + Phenylephirine + Zink Gluconate
104. S.O. 953(E) Paracetamol + Phenylephrine + Triprolidine + Caffeine
105. S.O. 954(E) Caffeine + Paracetamol + Phenylephrine + Cetirizine
106. S.O. 963(E) Caffeine + Paracetamol + Chlorpheniramine
107. S.O. 964(E) Ammonium Chloride + Dextromethorphan + Cetirizine + Menthol
108. S.O. 965(E) Dextromethorphan + Paracetamol + Cetirizine + Phenylephrine
109. S.O. 966(E) Chlorpheniramine + Terpin + Antimony Potassium Tartrate + Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Menthol
110. S.O. 967(E) Terbutaline + Etofylline + Ambroxol
111. S.O. 968(E) Paracetamol + Codeine + Chlorpheniramine
112. S.O. 969(E) Paracetamol+Pseudoephedrine+Certirizine+Caffeine
113. S.O. 970(E) Chlorpheniramine+Ammonium Chloride + Menthol
114. S.O. 971(E) N-Acetyl Cysteine + Ambroxol + Phenylephrine + Levocertirizine
115. S.O. 972(E) Dextromethorphan + Phenylephrine + Tripolidine + Menthol
116. S.O. 973(E) Salbutamol + Certirizine + Ambroxol
117. S.O. 974(E) Dextromethorphan + Phenylephrine + Bromhexine + Guaifenesin + Chlorpheniramine
118. S.O. 975(E) Nimesulide + Certirizine + Phenylephrine
119. S.O. 976(E) Naphazoline + Chlorpheniramine + Zinc Sulphate + Boric Acid + Sodium Chloride + Chlorobutol
120. S.O. 977(E) Paracetamol + Bromhexine + Phenylephrine + Chlorpheniramine + Guaifenesin
121. S.O. 978(E) Salbutamol + Bromhexine
122. S.O. 979(E) Dextromethorphan + Phenylephrine + Guaifenesin + Certirizine + Acetaminophen
123. S.O. 980(E) Guaifenesin + Bromhexine + Chlorpheniramine + Paracetamol
124. S.O. 981(E) Chlorpheniramine + Ammonium Chloride + Chloroform + Menthol
125. S.O. 982(E) Salbutamol + Choline Theophylinate + Ambroxol
126. S.O. 983(E) Chlorpheniramine + Codeine Phosphate + Menthol Syrup
127. S.O. 984(E) Pseudoephedrine + Bromhexine
128. S.O. 985(E) Certirizine + Phenylephrine + Paracetamol + Caffeine + Nimesulide
129. S.O. 986(E) Dextromethorphan + Cetirizine + Guaifenesin + Ammonium Chloride
130. S.O. 987(E) Ambroxol + Salbutamol + Choline Theophyllinate + Menthol
131. S.O. 988(E) Paracetamol + Chlorpheniramine + Ambroxol + Guaifenesin + Phenylephrine
132. S.O. 989(E) Chlorpheniramine + Vasaka + Tolubalsm + Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Menthol
133. S.O. 990(E) Bromhexine + Cetrizine + Phenylephrine IP+Guaifenesin + Menthol
134. S.O. 991(E) Dextromethorphan + Ambroxol + Ammonium Chloride + Chlorpheniramine + Menthol
135. S.O. 992(E) Dextromethorphan + Phenylephrine + Cetirizine + Zinc + Menthol
136. S.O. 993(E) Terbutaline + N-Acetyl L-Cysteine + Guaifenesin
137. S.O. 994(E) Calcium Gluconate + Levocetirizine
138. S.O. 995(E) Paracetamol + Levocetirizine + Pseudoephedrine
139. S.O. 996(E) Salbutamol + Choline Theophylinate + Carbocisteine
140. S.O. 997(E) Chlorpheniramine + Vitamin C
141. S.O. 998(E) Calcium Gluconate + Chlorpheniramine + Vitamin C
142. S.O. 999(E) Chlorpheniramine + Paracetamol + Pseudoephedrine + Caffeine

143. S.O. 1000(E) Guaifenesin + Bromhexine + Chlorpheniramine + Phenylephrine + Paracetamol + Serratiopeptidase
144. S.O. 1001(E) Paracetamol + Pheniramine
145. S.O. 1023(E) Bromhexine + Dextromethorphan
146. S.O. 1024(E) Dextromethophan + Chlopheniramine + Bromhexine
147. S.O. 1026(E) Dextrometharphan + Chlopheniramine + Ammonium + Sodium Citrate + Menthol
148. S.O. 1030(E) Paracetamol + Ambroxol + Phenylephrine + Chlorpheniramine
149. S.O. 1032(E) Albuterol + Etofylline + Bromhexine + Menthol
150. S.O. 1033(E) Albuterol + Bromhexine + Theophylline
151. S.O. 1034(E) Salbutamol+Hydroxyethyltheophylline (Etofylline) + Bromhexine
152. S.O. 1035(E) Paracetamol+Phenylephrine+Levocetirizine+Sodium Citrate
153. S.O. 1036(E) Paracetamol + Propyphenazone + Caffeine
154. S.O. 1037(E) Guaifenesin + Diphenhydramine + Bromhexine + Phenylephrine
155. S.O. 1039(E) Bromhenxine + Phenylephrine + Chlorpheniramine + Paracetamol
156. S.O. 1047(E) Phenylephrine + Chlorpheniramine + Paracetamol + Bromhexine + Caffeine
157. S.O. 789(E) Pholcodine + Promethazine
158. S.O. 790(E) Paracetamol + Promethazine
159. S.O. 792(E) Cetirizine + Diethyl Carbamazine
160. S.O. 797(E) Paracetamol + Prochloperazine
161. S.O. 1005(E) Levocetirizine + Ambroxol + Phenylephrine + Paracetamol

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মনে করে কাশির জন্য আলাদা করে কোনো ওষুধের দরকার নেই

কাশির ওষুধ বলতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় ছিল কেবল শুকনো কাশির দমক কমানোর জন্য Dextromethorphan, এই ওষুধটাও ২০০৩ সালে প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

বাজারে চালু কাশির ওষুধগুলোতে নানান অ্যালার্জির ওষুধ, কফকে বার করার ওষুধ, কফকে পাতলা করার ওষুধ, কাশির দমক কমানোর ওষুধ, হাঁপানির ওষুধ মেশানো থাকে।

➢ অ্যালার্জির ওষুধ ক্লোরফেনিরামিন, ফেনিরামিন, সেটিরিজিন, ইত্যাদি অ্যালার্জির ভালো ওষুধ। কিন্তু কাশিতে ব্যবহার করলে এরা কফকে আঠালো করে দেয়, কেশে সহজে কফ বার করা যায় না, ফুসফুসে কফ জমে গিয়ে বেশি ক্ষতি হয়। তবু এসব ওষুধ খেলে লোকে আরাম বোধ করেন, কেননা এগুলো খেলে ঝিমুনি আসে।

➢ কফকে বার করার ও কফকে পাতলা করার ওষুধ হিসেবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সাইট্রেট, গুয়াফেনিসিন, ব্রোমহেক্সিন, এম্ব্রক্সল, ইত্যাদি মেশানো হয়। বিখ্যাত ওষুধ-বিজ্ঞানীদের মতে এদের কার্যক্ষমতা জলের চেয়ে বেশি নয়।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মনে করে কাশির জন্য আলাদা করে কোনো ওষুধের দরকার নেই

➢ শুকনো কাশির দমক কমানোর ওষুধ হিসেব কোডিন বা ডেক্সট্রোমেথরফান কার্যকর বটে, কিন্তু এগুলোতে নেশায় পড়ার ঝুঁকি থাকে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে ২৮-২৯ বছর আগে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নিষিদ্ধ হওয়ার পর আমাদের দেশ থেকে ফেন্সিডিল কাফ সিরাপ চোরাই চালান হয় সেখানে। ফেন্সিডিলে থাকে অ্যালার্জির ওষুধ ক্লোরফেনিরামিন আর কাশির দমক কমানোর কোডিন। কেবল বাংলাদেশ নয়, আমাদের দেশেও বিপুল ব্যাবসা এই ওষুধের। ২০০৯-এর ডিসেম্বরে পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি টাকার ব্যাবসা করেছে পিরামলের তৈরি ফেন্সিডিল, তৃতীয় স্থানে আছে একই উপাদানে তৈরি ফাইজারের কোরেক্স।

➢ হাঁপানির ওষুধ টারবুটালিন বা সালবুটামল সংকুচিত শ্বাসনালীকে প্রসারিত করে। অনেক কোম্পানি কাশির ওষুধে এগুলোকে মেশায়, যেমন, গ্রিলিংটাস-বিএম, ভেন্টোরলিন এক্সপেক্টোরেন্ট।

একটা অবাস্তব ব্যাপার লক্ষ করুন, কাশির ওষুধে কফকে বার করার ও কফকে পাতলা করার ওষুধের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে কাশির দমক কমানোর ওষুধ—দু-ধরনের ওষুধের কাজ পরস্পরের বিপরীত। হাঁপানির ওষুধ শ্বাসনালীকে প্রসারিত করে, অ্যালার্জির ওষুধ শ্বাসনালীকে শুকিয়ে দিয়ে তার কাজে ব্যাঘাত ঘটায়।

ভারতে অনেকগুলো কাশির ওষুধই কিন্তু আগে থেকেই নিষিদ্ধ ছিল।

ভারতের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ১৯৯১ সালে সালবুটামল বা অন্য শ্বাসনালী প্রসারকের সঙ্গে মস্তিষ্কে কাজ করে এমন কাশির দমক কমানোর ওষুধ ও অ্যালার্জির ওষুধের মিশ্রণ নিষিদ্ধ করেছে।

১৯৯৯-এ নিষিদ্ধ হয়েছে মস্তিষ্কে কাজ করে এমন কাশির দমক কমানোর ওষুধের সঙ্গে অ্যালার্জির ওষুধের মিশ্রণ।

একই বছর নিষিদ্ধ হয়েছে হাঁপানির কাশি কমানোর ওষুধ বলে চালু ওষুধে কাশির দমক কমানোর ওষুধ বা অ্যালার্জির ওষুধের মিশ্রণ।

অ্যান্টিবায়োটিকের মিশ্রণ

1. S.O. 752(E) Azithromycin + Cefixime
2. S.O. 753(E) Amoxicillin + Dicloxacillin
3. S.O. 754(E) Amoxicillin 250 mg + Potassium Clavulanate Diluted 62.5 mg
4. S.O. 755(E) Azithromycin + Levofloxacin
5. S.O. 756(E) Cefixime + Linezolid
6. S.O. 757(E) Amoxicillin + Cefixime + Potassium Clavulanic Acid
7. S.O. 758(E) Ofloxacin + Nitazoxanide
8. S.O. 759(E) Cefpodoxime Proxetil + Levofloxacin
9. S.O. 760(E) Azithromycin, Secnidazole and Fluconazole
10. S.O. 761(E) Levofloxacin + Ornidazole + Alpha Tocopherol Acetate
11. S.O. 762(E) Nimorazole + Ofloxacin
12. S.O. 763(E) Azithromycin + Ofloxacin
13. S.O. 764(E) Amoxycillin + Tinidazole
14. S.O. 765(E) Doxycycline + Serratiopeptidase
15. S.O. 766(E) Cefixime + Levofloxacin
16. S.O. 767(E) Ofloxacin + Metronidazole + Zinc Acetate
17. S.O. 768(E) Diphenoxylate + Atropine + Furazolidonee
18. S.O. 769(E) Fluconazole Tablet, Azithromycin Tablet and Ornidazole Tablets
19. S.O. 770(E) Ciprofloxacin + Phenazopyridine
20. S.O. 771(E) Amoxycillin + Dicloxacillin + Serratiopeptidase
21. S.O. 772(E) Azithromycin + Cefpodoxime
22. S.O. 774(E) Cefuroxime + Linezolid
23. S.O. 775(E) Ofloxacin + Ornidazole + Zinc Bisglycinate
24. S.O. 776(E) Metronidazole + Norfloxacin
25. S.O. 777(E) Amoxicillin + Bromhexine
26. S.O. 778(E) Ciprofloxacin + Fluticasone + Clotrimazole + Neomycin
27. S.O. 779(E) Metronidazole + Tetracycline
28. S.O. 780(E) Cephalexin + Neomycin + Prednisolone
29. S.O. 781(E) Azithromycin + Ambroxol
30. S.O. 844(E) Furazolidone + Metronidazole + Loperamide
31. S.O. 847(E) Norfloxacin+ Metronidazole + Zinc Acetate
32. S.O. 865(E) Azithromycin + Acebrophylline
33. S.O. 884(E) Levofloxacin + Bromhexine
34. S.O. 904(E) Roxithromycin + Serratiopeptidase
35. S.O. 1031(E) Ofloxacin + Ornidazole Suspension

স্বাস্থ্য-দপ্তর-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা বলেছেন জীবাণুনাশকের এই মিশ্রণগুলি ক্ষতিকর এবং এগুলির নিরাপদ বিকল্প রয়েছে।

ডায়াবেটিসের মুখে খাওয়ার ওষুধের মিশ্রণ

1. S.O. 785(E) Metformin + Atorvastatin
2. S.O. 802(E) Metformin 1000/500 mg + Pioglitazone 7.5mg + Glimepiride 1/2mg
3. S.O. 803(E) Gliclazide 80 mg + Metformin 325 mg
4. S.O. 804(E) Voglibose+ Metformin + Chromium Picolinate
5. S.O. 805(E) Pioglitazone 7.5mg + Metformin 500/1000mg
6. S.O. 806(E) Glimepiride 1mg/2mg/3mg + Pioglitazone 15mg + Metformin 1000mg
7. S.O. 807(E) Glimepiride 1mg/2mg+ Pioglitazone 15mg + Metformin 850mg
8. S.O. 808(E) Metformin 850mg + Pioglitazone 7.5 mg + Glimepiride 2mg
9. S.O. 809(E) Metformin 850mg + Pioglitazone 7.5 mg + Glimepiride 1mg
10. S.O. 810(E) Metformin 500mg +Gliclazide SR 30mg/60mg + Pioglitazone 7.5mg
11. S.O. 811(E) Voglibose + Pioglitazone + Metformin
12. S.O. 812(E) Metformin + Bromocriptine
13. S.O. 813(E) Metformin + Glimepiride + Methylcobalamin
14. S.O. 814(E) Pioglitazone 30 mg + Metformin 500 mg
15. S.O. 815(E) Glimepiride + Pioglitazone + Metformin
16. S.O. 816(E) Glipizide 2.5mg + Metformin 400 mg
17. S.O. 817(E) Pioglitazone 15mg + Metformin 850 mg
18. S.O. 818(E) Metformin ER + Gliclazide MR + Voglibose

19. S.O. 819(E) Chromium Polynicotinate + Metformin
20. S.O. 820(E) Metformin + Gliclazide + Piogllitazone + Chromium Polynicotinate
21. S.O. 821(E) Metformin + Gliclazide + Chromium Polynicotinate
22. S.O. 822(E) Glibenclamide + Metformin (SR)+ Pioglitazone
23. S.O. 823(E) Metformin (Sustained Release) 500mg + Pioglitazone 15 mg + Glimepiride 3mg
24. S.O. 824(E) Metformin (SR) 500mg + Pioglitazone 5mg
25. S.O. 1029(E) Gliclazide 40mg + Metformin 400mg
26. S.O. 1041(E) Telmisartan + Metformin
    S.O. 1044(E) Benfotiamine + Metformin

ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় প্রধানত তিন ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়—সালফোনিল ইউরিয়া গোত্রের ওষুধ গ্লিবেনক্ল্যামাইড, গ্লিপিজাইড বা গ্লিমিপিরাইড; বাইগুয়ানাইডস গোত্রের মেটফরমিন এবং গ্লিটাজোন পায়োগ্লিটাজোন।

সালফোনিল ইউরিয়া গোত্রের ওষুধ খেতে হয় খাওয়ার আগে, কোনোটি দিনে একবার, কোনোটি দুই বার। মেটফরমিন খেতে হয় খাওয়ার পর, দিনে দুই বার বা তিন বার। আর পায়োগ্লিটাজোন দিনে একবার। এই ওষুধগুলির একাধিককে একসঙ্গে মেশালে সেই ভাবে সেবন করা যায় না, তা বলাই বাহুল্য।

উচ্চরক্তচাপের ওষুধের মিশ্রণ

1. S.O. 782(E) Cilnidipine + Metoprolol Succinate + Metoprolol Tartrate
2. S.O. 786(E) Clindamycin + Telmisartan
3. S.O. 787(E) Olmesartan + Hydrochlorothiazide + Chlorthalidone

স্বাস্থ্য দপ্তর-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা বলছেন উচ্চরক্তচাপ কমানোর ওষুধের এই মিশ্রণগুলি ক্ষতিকর এবং এগুলির নিরাপদ বিকল্প রয়েছে।

পেপটিক আলসারের ওষুধ মিশ্রণ

1. S.O. 833(E) Rabeprazole + Zinc Carnosine
2. S.O. 834(E) Magaldrate + Famotidine + Simethicone
3. S.O. 836(E) Magaldrate + Ranitidine + Pancreatin + Domperidone
4. S.O. 837(E) Ranitidine + Magaldrate + Simethicone
5. S.O. 838(E) Magaldrate + Papain + Fungul Diastase + Simethicone
6. S.O. 839(E) Rabeprazole + Zinc + Domperidone
7. S.O. 840(E) Famotidine + Oxytacaine + Magaldrate
8. S.O. 841(E) Ranitidine + Domperidone + Simethicone
9. S.O. 842(E) Alginic Acid + Sodium Bicarbonate + Dried Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide
10. S.O. 846(E) Ranitidine + Magaldrate
11. S.O. 849(E) Oxetacaine + Magaldrate + Famotidine
12. S.O. 850(E) Pantoprazole (as Enteric Coated Tablet) + Zinc Carnosine (as Film Coated Tablets)
13. S.O. 851(E) Zinc Carnosine + Magnesium Hydroxide + Dried Aluminium Hydroxide + Simethicone
14. S.O. 852(E) Zinc Carnosine + Sucralfate
15. S.O. 1038(E) Dried Alumnium Hydroxie Gel + Prophantheline + Diazepam

স্বাস্থ্য দপ্তর-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা বলছেন পেপটিক আলসারের ওষুধের এই মিশ্রণগুলি ক্ষতিকর এবং এগুলির নিরাপদ বিকল্প রয়েছে।

মনোরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ মিশ্রণ

1. S.O. 788(E) L-5-Methyltetrahydrofolate Calcium + Escitalopram
2. S.O. 795(E) Imipramine + Diazepam
3. S.O. 796(E) Flupentixol + Escitalopram
4. S.O. 799(E) Imipramine + Chlordiazepoxide + Trifluoperazine + Trihexyphenidyl
5. S.O. 800(E) Chlorpromazine + Trihexyphenidyl

স্বাস্থ্য দপ্তর-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা বলছেন মনোরোগের ওষুধের এই মিশ্রণগুলি ক্ষতিকর এবং এগুলির নিরাপদ বিকল্প রয়েছে।

অন্যান্য ওষুধ মিশ্রণ

1. S.O. 711(E) Dicyclomine + Paracetamol + Domperidone
2. S.O. 722(E) Tamsulosin + Diclofenac
3. S.O. 732(E) Glucosamine + Methyl Sulfonyl Methane + Vitamin D3 + Manganese + Boron + Copper + Zinc
4. S.O. 734(E) Tranexamic Acid + Proanthocyanidin
5. S.O. 735(E) Benzoxonium Chloride + Lidocaine
6. S.O. 739(E) Paracetamol + Domperidone + Caffeine
7. S.O. 773(E) Lignocaine + Clotrimazole + Ofloxacin + Beclomethasone
8. S.O. 783(E) L-Arginine + Sildenafil
9. S.O. 784(E) Atorvastatin + Vitamin D3 + Folic Acid + Vitamin B12 + Pyridoxine
10. S.O. 791(E) Betahistine + Ginkgo Biloba Extract + Vinpocetine + Piracetam
11. S.O. 793(E) Doxylamine + Pyridoxine + Mefenamic Acid + Paracetamol

12. S.O. 794(E) Drotaverine + Clidinium + Chlordiazepoxide
13. S.O. 798(E) Gabapentin + Mecobalamin + Pyridoxine + Thiamine
14. S.O. 801(E) Ursodeoxycholic Acid + Silymarin
15. S.O. 825(E) Chloramphenicol + Beclomethasone + Clomitrimazole + Lignocaine
16. S.O. 826(E) Clotrimazole + Ofloxaxin + Lignocaine + Glycerine and Propylene Glycol
17. S.O. 827(E) Chloramphennicol + Lignocaine + Betamethasone + Clotrimazole + Ofloxacin + Antipyrine
18. S.O. 828(E) Ofloxacin + Clotrimazole + Betamethasone + Lignocaine
19. S.O. 829(E) Gentamicin Sulphate + Clotrimazole + Betamethasone + Lignocaine
20. S.O. 830(E) Clotrimazole + Beclomethasone + Ofloxacin + Lignocaine
21. S.O. 831(E) Becloemthasone + Clotrimazole + Chloramphenicol + Gentamycin + Lignocaine Ear drops
22. S.O. 832(E) Flunarizine + Paracetamole + Domperidone
23. S.O. 835(E) Cyproheptadine + Thiamine
24. S.O. 843(E) Clidinium + Paracetamol + Dicyclomine + Activated Dimethicone
25. S.O. 848(E) Zinc Carnosine + Oxetacaine
26. S.O. 853(E) Mebeverine & Inner HPMC capsule (Streptococcus Faecalis + Clostridium butyricum + Bacillus mesentricus + Lactic Acid Bacillus)
27. S.O. 854(E) Clindamycin + Clotrimazole + Lactic Acid Bacillus
28. S.O. 855(E) Sildenafil + Estradiol Valerate
29. S.O. 856(E) Clomifene Citrate + Ubidecarenone + Zinc + Folic Acid + Methylcobalamin + Pyridoxine + Lycopene+ Selenium + Levocarnitine Tartrate + L-Arginine
30. S.O. 857(E) Thyroxine + Pyridoxine + Folic Acid
31. S.O. 858(E) Gentamycin + Dexamethasone + Chloramphenicol + Tobramycin + Ofloxacin
32. S.O. 1002(E) Betamethasone + Fusidic Acid + Gentamycin + Tolnaftate + Iodochlorhydroxyquinoline
33. S.O. 1003(E) Clobetasol + Ofloxacin + Miconazole + Zinc Sulphate

34. S.O. 1004(E) Clobetasole + Gentamicin + Miconazole + Zinc Sulphate
35. S.O. 1006(E) Permethrin + Cetrimide + Menthol
36. S.O. 1007(E) Beclomethasone + Clotimazole + Neomycin + Iodochlorohydroxyquinone
37. S.O. 1008(E) Neomycin + Doxycycline
38. S.O. 1009(E) Ciprofloxacin + Fluocinolone + Clotrimazole + Neomycin + Chlorocresol
39. S.O. 1010(E) Clobetasol + Ofloxacin + Ketoconazol + Zinc Sulphate
40. S.O. 1011(E) Betamethasone + Gentamicin + Tolnaftate + Iodochlorhydroxyquinoline
41. S.O. 1012(E) Clobetasol + Gentamicin + Tolnaftate + Iodochlorhydroxyquinone + Ketoconazole
42. S.O. 1013(E) Allantoin + Dimethieone + Urea + Propylene + Glycerin + Liquid Paraffin
43. S.O. 1014(E) Acriflavine + Thymol + Cetrimide
44. S.O. 1015(E) Betamethasone + Neomycin + Tolnaftate + Iodochlorohydroxyquinoline + Cholorocresol
45. S.O. 1016(E) Clobetasol + Neomycin + Miconazole + Clotrimazole
46. S.O. 1017(E) Ketoconazole + Tea Tree oil + Allantion + Zinc Oxide + Aloe Vera + Jojoba oil + Lavander oil + Soa noodels
47. S.O. 1018(E) Clobetasol Propionate + Ofloxacin + Ornidazole + Terbinafine
48. S.O. 1019(E) Clobetasol + Neomycin + Miconazole + Zinc Sulphate
49. S.O. 1020(E) Beclomethasone Diproprionate + Neomycin + Tolnaftate + Iodochlorhydroxyquinoline + Chlorocresol

50. S.O. 1021(E) Betamethasone + Gentamycin + Zinc Sulphate + Clotrimoazole + Chlorocresol
51. S.O. 1022(E) Borax + Boric Acid + Naphazoline + Menthol + Camphor + Methyl Hydroxy Benzoate
52. S.O. 1025(E) Menthol + Anesthetic Ether
53. S.O. 1027(E) Ergotamine Tartrate + Belladona Dry Extarct+Caffeine + Paracetamol
54. S.O. 1028(E) Phenytoin + Phenobarbitone
55. S.O. 1040(E) Beclomethasone + Clotrimazole + Gentamicin + lodochlorhydroxyquinoline
56. S.O. 1042(E) Ammonium Citrate + Vitamin B 12 + Folic Acid + Zinc Sulphate
57. S.O. 1043(E) Levothyroxine + Phyridoxine + Nicotinamide
58. S.O. 1045(E) Thyroid + Thiamine + Riboflavin + Phyridoxine + Calcium Pantothenate + Tocopheryl Acetate + Nicotinamide
59. S.O. 1046(E) Ascorbic Acid + Manadione Sodium Bisulphate + Rutin + Dibasic Calcium Phosphate + Adrenochrome mono Semicarbazone
60. S.O. 1048(E) Clotrimazole + Beclomethasone + Lignocaine + Ofloxacin + Acetic Aicd + Sodium Methyl Paraben + Propyl Paraben

এতগুলো ওষুধের নাম আমরা কেন দিলাম, তাও ইংরাজিতে? পাঠকের মনে এ প্রশ্ন আসতেই পারে। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, সরকার ক্ষতিকর ওষুধ নিষিদ্ধ করেছে মানেই বাজারে সেই ওষুধগুলি পাওয়া যাবে না—এমন কিন্তু নয়। আগেই বলেছি একটি সমীক্ষায় আমরা দেখেছি নিষিদ্ধ ওষুধ নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও তার রমরমা বাজার চলে। জনসাধারণ সজাগ হয়ে

সরকার ক্ষতিকর ওষুধ নিষিদ্ধ করেছে মানেই বাজারে সেই ওষুধগুলি পাওয়া যাবে না—এমন কিন্তু নয়। আগেই বলেছি একটি সমীক্ষায় আমরা দেখেছি নিষিদ্ধ ওষুধ নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও তার রমরমা বাজার চলে। জনসাধারণ সজাগ হয়ে সরকারের ওপর চাপ দিলেই কেবল ওষুধ-নিয়ন্ত্রক দপ্তর সজাগ হয়।

সরকারের ওপর চাপ দিলেই কেবল ওষুধ-নিয়ন্ত্রক দপ্তর সজাগ হয়। সুতরাং জানতে হবে আপনাকেও, কেননা সরকারকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে আপনার চাপই। আর যেহেতু 'নিষিদ্ধ ওষুধ'ও বেশ কিছুদিন বাজারে চালু থাকবে, সেহেতু নিজের নিরাপত্তার খাতিরেই আপনার এই ওষুধগুলির নাম জেনে নিলে ভালো হয়। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার সম্পাদক

Advt.

মিডিয়া কবলমুক্ত, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিয়ু

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ: বই-চিত্র, কলেজস্ট্রিট, কফি হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুঠোফোন: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২
৯৮৩০৮৪৭১৫৯

বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে: পিট সিগার ক্রোড়পত্র

টুকরো খবর

ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন নিষিদ্ধ করার পক্ষে ভারতের ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞরা

সম্প্রতি ভারত সরকার এক অধ্যাদেশ জারি করে কয়েকশো ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন তৈরি ও বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা লাগু করেছেন। ভারতের ত্বকরোগ, যৌনরোগ ও কুষ্ঠরোগ বিশেষজ্ঞদের অ্যাসোসিয়েশন (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ডার্মাটোলজিস্ট, ভেনেরিয়োলজিস্ট অ্যান্ড লেপ্রোলজিস্টস, সংক্ষেপে আইএডিভিএল) চায় যে সেই নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত যেন কোনোমতেই বদলানো না হয়।

যে সব ত্বকের ক্রিম ইত্যাদি সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে আইএডিভিএল অনেক দিন থেকেই আপত্তি তুলছে। বিশেষ করে লাগানোর স্টেরয়েড মেশানো যে সব ক্রিম মুড়িমুড়কির মতো বাজারে ‘ফর্সা হবার ক্রিম’ হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে আইএডিভিএল তাতে অনেক আগে থেকেই বিপদের কথা বলে আসছে। এগুলো ওষুধের দোকানদার, ডিগ্রিহীন ‘চিকিৎসক’, এমনকী অনেক পাশ-করা ডাক্তারও লিখছেন। কিন্তু এতে ত্বকের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে।

যে সব ত্বকের ক্রিম নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ত্বকরোগে ডিগ্রিধারী আইএডিভিএল সদস্যরা সেগুলো নিষিদ্ধ হবার আগেও প্রায় লিখতেনই না বলে জানিয়েছেন। মোটামুটি শতখানেক ব্র্যান্ডনামের এইসব ওষুধের অনেকগুলোতে আছে অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিফাঙ্গাল ও স্টেরয়েড— এসবের বিচিত্র ককটেল। এগুলো জীবাণু-সংক্রমণে বা ছত্রাক-সংক্রমণে দিলে, স্টেরয়েডের জন্য রোগ সারত না কিন্তু সাময়িক আরাম হত। এইভাবে রোগটা থেকে যেত, কিন্তু যে ডাক্তার (বা দোকানদার) ওই ককটেল রোগীকে দিতেন, তাঁর ওপর রোগীর আস্থা কমত না। ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞরা এই তিনরকম মিশ্র ওষুধ খুবই কম লিখতেন, কেননা এই তিনটি ওষুধের এক-একটা আলাদা আলাদা রোগের ক্ষেত্রে কার্যকর। কিন্তু কেউ-না-কেউ এই ওষুধগুলো লিখতেন। অনেক সময়েই রোগীর জন্য তার ফল খুবই খারাপ হত।

আইএডিভিএল ‘লাগানোর স্টেরয়েডের ভুল ব্যবহার’ নিয়ে একটা টাস্ক ফোর্স অনেকদিন আগেই গঠন করেছে, এবং সেই টাস্ক ফোর্স বহুদিন ধরেই এই ধরনের নানা ওষুধের বিরুদ্ধে বলছিল। এই টাস্ক ফোর্স-এর মুখপাত্র জানান, ‘ক্লোবেটোসল প্রোপায়োনেট-এর মতো জোরালো স্টেরয়েড, আর তার সঙ্গে ওফ্লক্সাসিন, অরনিডাজোল, টারবিনাফিন—এসবের মতো জীবাণু ও ছত্রাক মারা ওষুধ একসঙ্গে দিয়ে ত্বকের সংক্রমণের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।” আবার, একসঙ্গে একাধিক ওষুধ লাগানোর ফলে, যখন ওষুধের ক্ষতিকর পার্শ্বক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছিল, তখন কোন ওষুধের জন্য সেটা হচ্ছে সেটাও বোঝা শক্ত হয়ে পড়ছিল। যেমন, নিওমাইসিন বলে অ্যান্টিবায়োটিক-টি স্টেরয়েডের সঙ্গে একই ক্রিমে একই মলমে ব্যবহৃত হবার ফলে, নিওমাইসিন-এর পার্শ্বক্রিয়ার লক্ষণ ঢেকে দিচ্ছিল স্টেরয়েড। অন্যদিকে, কী অসুখ হয়েছে সেটা না বুঝেই আনতাবড়ি মিশ্র মলম লাগানোর ফলে জীবাণুগুলো ওষুধ-প্রতিরোধী হবার সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিচারে ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও, কোম্পানিগুলো এই সব ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন মলম বাজারে ছাড়ার অনুমতি পেল কী করে? সেটা সত্যিই রহস্যময় ব্যাপার। তবে পদ্ধতি হিসেবে, কেন্দ্রীয় ড্রাগস

> যে সব ত্বকের ক্রিম ইত্যাদি সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে আইএডিভিএল অনেক দিন থেকেই আপত্তি তুলছে। বিশেষ করে লাগানোর স্টেরয়েড মেশানো যে সব ক্রিম মুড়িমুড়কির মতো বাজারে ‘ফর্সা হবার ক্রিম’ হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে আইএডিভিএল তাতে অনেক আগে থেকেই বিপদের কথা বলে আসছে।

স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও)-এর ছাড়পত্র পাবার পর তবে রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লাইসেন্স দেয়। এটা ঠিকঠাক মানা হয় কিনা, সে ব্যাপারে ধোঁয়াশা রয়েছে।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, মার্চ ২২, ২০১৬

http://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabead/doctors-want-ban-on-deadly-fairness-creams-to-stay/articleshow/51505062.cms?utm source=toimobile&utm medium=Facebook&utm campaign=referral

সম্পাদকীয় সংযোজন: আইএডিভিএল-এর মতো চিকিৎসকদের বিভিন্ন স্পেশালিটির সংগঠন নিজস্ব পেশাগত ও অ্যাকাডেমিক কাজকর্ম চালায়, অ্যাকাডেমিক ও অন্যান্য মিটিং করে, জার্নাল বের করে। পেশাগত গুণমান বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় নানা দেশে এই ধরনের সংগঠনের অবদান অনস্বীকার্য। এ দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো এই সব সংগঠনকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। তার মধ্যেও যে পেশার দায়িত্বপালন কিছুটা করা যায়, তার একটা উদাহরণ হল আইএডিভিএল-এর এই প্রচেষ্টা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

এপিস্ট্যাক্সিস—নাক থেকে রক্তপাত: রোগ না উপসর্গ?

যারা এই লেখা পড়ছেন, এপিস্ট্যাক্সিস কথাটা হয়তো তাঁদের অনেকের কাছেই অচেনা ঠেকতে পারে। কিন্তু যদি বলা হয় রাতবিরেতে হঠাৎ নাক থেকে রক্তপাত হওয়ার ফলে হাসপাতালে ছুটোছুটি করার অভিজ্ঞতা আছে কিনা, তবে অনেকেই হাত তুলবেন। প্রায় সকলের দেখা, এবং অত্যন্ত ভয় পাওয়ানো, এই উপসর্গকে মোকাবিলা করার কথা বলছেন **ডা. সোনিয়া বেগম।**

চিত্র ১. নাক থেকে রক্তপাত বন্ধ করতে বাইরে থেকে চাপ দেওয়া

নাক থেকে রক্তপাত, ডাক্তারি পরিভাষায় বলা হয় এপিস্ট্যাক্সিস, চিকিৎসকদের কাছে রোজকার সাধারণ ব্যাপার হলেও, রোগী আর তার পরিজনের কাছে ভীষণই উদ্বেগজনক ঘটনা হয়ে ওঠে। তার ওপর অধিকাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে এর যথাযথ চিকিৎসার পরিকাঠামো ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অপ্রতুলতার ফলে কর্তব্যরত চিকিৎসকের পক্ষে উচ্চতর

> ৭০-৮০% ক্ষেত্রে এই রক্তপাতের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, চিকিৎসা পরিভাষায় ইডিওপ্যাথিক!

পরিকাঠামোযুক্ত হাসপাতালে পাঠানো ছাড়া দ্বিতীয় উপায় থাকে না, যা রোগী আর তার পরিজনের আরোই উদ্বেগ ও বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে। এই সব কিছুর পর বড়ো হাসপাতালে পৌঁছে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় রক্তপাত নিজে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ ইঞ্জেকশনেও বন্ধ না হওয়ায় অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেশ বিভ্রান্তিমূলক, ঘাবড়ে দেবার মতো। তাই এই লেখার উদ্দেশ্য হল ভারী ভারী ডাক্তারি পরিভাষার কচকচি এড়িয়ে মোটের ওপর সহজ ভাষায় এপিস্ট্যাক্সিস নিয়ে আলোচনা, এর কারণ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে কাজের কথাগুলো বলা।

এপিস্ট্যাক্সিস ব্যাপারটা কী?

আমাদের নাকের ভিতরটা ঢাকা থাকে নরম ও আর্দ্র আবরণী কলা বা মিউকাস মেমব্রেন দ্বারা। এই আবরণের ঠিক নীচে থাকে অসংখ্য সূক্ষ্ম রক্তনালী—শিরা ও ধমনি। এই রক্তনালীগুলো মিউকাস মেমব্রেনের নীচে জালের মতো বিন্যস্ত থাকে। কয়েকটি স্থানে বিভিন্ন দিক থেকে আসা রক্তনালী একসঙ্গে মিলে ঘন জালের মতো 'প্লেক্সাস' গঠন করে। এর মধ্যে দু-টি স্থান উল্লেখযোগ্য। একটি নাকের ভিতরে একেবারে সামনের দিকে, এর নাম লিটল্'স্ এরিয়া (Little's area), অন্যটি নাকের পিছন দিকে—উড্রাফ'স এরিয়া Woodruff's area। কোনো কারণে, আঘাত বা রোগের ফলে এই সূক্ষ্ম রক্তনালী ছিঁড়ে গেলে রক্তপাত হয়। দেখা গেছে

> নাকে সরাসরি ভোঁতা আঘাতে শিরা থেকে রক্তপাত হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মাথায় বড়ো বড়ো আঘাতের ক্ষেত্রে অনেক সময় করোটির হাড় ভেঙে বড়ো ধমনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সেই রক্তপাত সহজে বন্ধ হয় না।

যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রক্তপাত শিরা থেকে হয়, যার উৎস অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দু-টি প্লেক্সাস।

এপিস্ট্যাক্সিস যেকোনো বয়সের মানুষের হতে পারে। তবে দেখা গেছে শিশু ও বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রেই এর প্রবণতা বেশি। রক্তপাতের কারণগুলিকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক, স্থানীয় (অর্থাৎ নাক ও সন্নিহিত স্থান) কারণ (local cause), দুই, সাধারণ শারীরবৃত্তীয় কারণ (systemic cause)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৭০-৮০% ক্ষেত্রে এই রক্তপাতের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, চিকিৎসা পরিভাষায় ইডিওপ্যাথিক (Idiopathic)!!!

রক্তপাতের স্থানীয় কারণ

১. আঘাত (Trauma): আঙুল দিয়ে নাক খোঁটার সময় নখের খোঁচা লেগে রক্তপাত প্রায়শই হয়। নাকে সরাসরি ভোঁতা কিছু দিয়ে আঘাত লেগে রক্তপাত হতে পারে। আবার মাথায় আঘাত লেগেও নাক থেকে রক্তপাত হতে পারে। সাধারণত নাকে সরাসরি ভোঁতা আঘাতে শিরা থেকে রক্তপাত হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মাথায় বড়ো

বড়ো আঘাতের ক্ষেত্রে অনেক সময় করোটির হাড় ভেঙে বড়ো ধমনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সেই রক্তপাত সহজে বন্ধ হয় না

২. নাকের গঠনগত সমস্যা: নাকের মাঝখানের হাড় বা তরুণাস্থি বাঁকা থাকলে রক্তপাতের সমস্যা হতে পারে।

৩. সংক্রমণ (Infection): ভাইরাল সংক্রমণ, নাকের ডিপথিরিয়া, সাইনাসের প্রদাহ বা সাইনুসাইটিসের কারণে রক্তপাত হতে পারে। এ ছাড়া অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস, নাকের সিফিলিস বা টিউবারকুলোসিস বা রাইনোস্পোরিডিওসিস্ ইত্যাদি কারণেও হতে পারে।

৪. যেকোনো জড়বস্তু, যেমন—বোতাম, পাথরের টুকরো, ধাতব গয়না বা খেলনা বা যন্ত্রের অংশ, ফলের বীজ, পেনসিল, রবার বা চকের টুকরো, ছোটো ব্যাটারি ইত্যাদি অনেক সময় বাচ্চারা নাকে ঢুকিয়ে ফেলে। এগুলো দীর্ঘ সময় ধরে নাকে থেকে গেলে স্থানীয় প্রদাহ সৃষ্টি করে, যার ফলে রক্তপাত হয়।

এ ছাড়াও দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণের রোগী অস্বাস্থ্যকরভাবে থাকার ফলে নাকে মাছির লার্ভা বা ম্যাগট জন্মায়, যা অনেক সময় নাক থেকে রক্তপাতের কারণ।

৫. নাক ও তার কাছাকাছি 'সাইনাস'-এর পলিপ ও টিউমার (বয়স্কদের ক্ষেত্রে বেশি), নাকের ভিতরে রক্তনালীর টিউমার বা হিমাঞ্জিওমা, নাকের পিছনের অংশ বা ন্যাসোফ্যারিনেক্সের টিউমার, বিশেষত জুভেনাইল ন্যাসোফ্যারিঞ্জিয়াল অ্যাঞ্জিয়োফাইব্রোমা (কিশোর বয়সি ছেলেদের বেশি

> কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে এপিস্ট্যাক্সিস হতে পারে। এই ওষুধগুলো রক্ত জমাট বাধার প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়।

হয়, বিপজ্জনক রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে, যা এমনকী রোগীর প্রাণহানির কারণ হতে পারে)। প্রসঙ্গত, অনেকের ধারণা 'সাইনাস' বোধহয় একটা রোগের নাম; ব্যাপারটা তা নয়। নাকের আশেপাশে চারজোড়া হাড় ফাঁপা, আর সেই ফাঁপা গহ্বরগুলোর ভেতরটা মিউকাস মেমব্রেন দিয়ে মোড়া—এই গহ্বরগুলোর নামই 'সাইনাস'।

এবার আসা যাক সিস্টেমিক বা সাধারণ শারীরবৃত্তীয় কারণগুলিতে।

১. উচ্চরক্তচাপ: যদিও একে ঠিক সরাসরি কারণ বলা যায় না। তবে দেখা গেছে নাক থেকে রক্তপাত হচ্ছে, এমন রোগীর রক্তচাপ বেশি হতে পারে, যার ফলে রক্তপাত বন্ধ করা মুশকিল হয়।

২. রক্ত জমাট বাঁধার উপাদানের অভাব বা অপ্রতুলতাজনিত কারণ: থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া বা অণুচক্রিকার অভাব, হিমোফিলিয়া, ভিটামিন 'সি' ও 'কে'-এর অভাব—শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি।

৩. রক্তনালীর গঠনগত সমস্যা

৪. যকৃৎ ও বৃক্কের প্রদাহ

৫. কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে এপিস্ট্যাক্সিস হতে পারে। এই ওষুধগুলো রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়। স্যালিসাইলেট্ নামক ব্যথা নিরাময়কারী (নন্-স্টেরয়েডাল অ্যান্টিইনফ্লামেটরি ড্রাগ-NSAID)

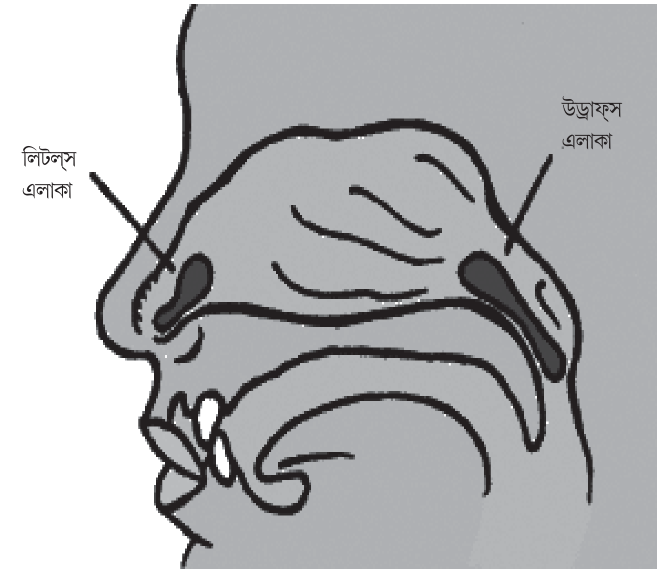

চিত্র ২. যেখান থেকে এপিস্ট্যাক্সিস বেশি হয়

ওষুধ এর একটি। এ ছাড়া অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল ইত্যাদি রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় এমন ওষুধও এর মধ্যে পড়ে।

৬. কখনো কখনো অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের হরমোনের পরিবর্তজনিত কারণে নাক ও দাঁতের মাঢ়ী থেকে রক্তপাত হয়।

৭. ভাইকেরিয়াস মেন্সস্ট্রুয়েশন (Vicarious menstruation): কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের মাসিক রজস্রাবের সময় নাক থেকে রক্তপাত হয়, যা ওই সময় অতিক্রান্ত হলে বন্ধ হয়ে যায়।

চিকিৎসা

নাক থেকে রক্তপাত বা এপিস্ট্যাক্সিসের চিকিৎসার দুটো ধাপ—প্রাথমিক চিকিৎসা এবং নির্দিষ্ট চিকিৎসা। হঠাৎ কারোর নাক থেকে রক্তপাত হলে প্রাথমিক চিকিৎসা বাড়িতেই শুরু করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রক্তপাত হয় নাকের সামনের দিকের লিটল্'স্ এরিয়া (Little's area) থেকে—তাই মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে নাক জোরে চেপে রাখতে হবে, নাক ঝাড়ার সময়

> অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রক্তপাত হয় নাকের সামনের দিকের লিটল্'স্ এরিয়া (Little's area) থেকে—তাই মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে নাক জোরে চেপে রাখতে হবে।

যেভাবে নাক দুই আঙুলে চেপে ধরা হয়, সেভাবে। নাকের ওপর বরফ লাগাতে পারলে ভালো হয়। এরপর রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকটবর্তী চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে এটা বোঝা গেছে যে নাক থেকে রক্তপাতের কারণ কেবল নাকেই সীমাবদ্ধ নয়, শরীরের অন্যান্য অংশের রোগ বা আঘাতের সঙ্গেও সম্পর্কিত হতে পারে, তাই এর চিকিৎসায় কেবল

চিকিৎসক নন, রোগী ও তার সঙ্গীকেও যোগদান করতে হবে। অযথা উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত না হয়ে চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ও রোগীকে পরীক্ষা করতে সাহায্য করা জরুরি। রোগীর সঙ্গে এমন একজন সঙ্গী থাকলে ভালো হয়, যিনি রোগীর অন্য কোনো রোগ, যেমন উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি আছে কি না, রোগী কী কী ওষুধ খান ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত থাকবেন। সম্ভব হলে রোগীর পুরোনো প্রেসক্রিপশন ও ওষুধ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া শ্রেয়।

অযথা উদ্বিগ্ন হবেন না, রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করুন।

চিকিৎসা হিসেবে প্রথমে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এমন ওষুধ (যেমন ট্রানেক্সেমিক অ্যাসিড বা ইথ্যামসাইলেট) ট্যাবলেট বা ইঞ্জেকশন হিসাবে দেওয়া হয়। রোগীর উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা কমানোর চিকিৎসা করা হয়। এতে রক্তপাত বন্ধ না হলে ন্যাসাল প্যাকিং (Nasal Packing) করতে হতে পারে----লম্বা সরু রিবন গজে তরল প্যারাফিন বা অ্যান্টিবায়োটিক মলম মাখিয়ে নাকের ভিতর স্তরে স্তরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, এর চাপে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। যদি এর পরেও নাকের পিছন দিক থেকে রক্তপাত হয়, তবে এর সঙ্গে নাকের পিছন দিকে প্যাকিং করতে হতে পারে। অধিকাংশ রক্তপাত এই চিকিৎসাতেই বন্ধ হয়ে যায়।

যদি তা না হয়, তবে এন্ডোস্কোপের সাহায্যে নাকের ভিতরের অংশ পরীক্ষা করে রক্তনালী বেঁধে বা ইলেক্ট্রো-কটারি করে রক্তপাত বন্ধ করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এতেও বন্ধ না হলে তখন রোগীকে অজ্ঞান করে বড়ো রক্তবাহী ধমনি বেঁধে দিতে হতে পারে। তবে শেষোক্ত এই সব পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সাধারণ চিকিৎসাকেন্দ্রে সাধারণত থাকে না। তখন রোগীকে উচ্চতর চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠাতে হয়। এ ছাড়া রোগীর যদি দুর্ঘটনাজনিত কারণে বা রক্ত জমাট বাঁধার অসুবিধার কারণে রক্তপাত হয়, তখন প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য রোগীকে উচ্চতর চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠাতে হতে পারে।

এই দীর্ঘ আলোচনা অচিকিৎসক মানুষের জন্য লেখা, যথাসম্ভব সহজ ভাষায় লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এর কিছু অংশ তথ্য হিসেবে প্রয়োজনীয়, আর কিছু অংশ কার্যক্ষেত্রে জরুরি, যা রোগী ও তার সঙ্গীরা মনে রাখলে রোগীর চিকিৎসা সুবিধাজনক হয়। সেই জরুরি কথাগুলো আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া যাক।

- নাকের রক্তপাত শুধু নাকের রোগ বা আঘাতের কারণে হয় না, সাধারণ শারীরবৃত্তীয় কারণেও হয়।
- অযথা উদ্বিগ্ন হবেন না, রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করুন।
- রোগীর অন্যান্য অসুস্থতা ও ওষুধপত্রের সম্পর্কে যিনি জানেন, তিনি রোগীর সঙ্গে থাকলে ভালো হয়, সম্ভব হলে রোগীর পুরোনো প্রেসক্রিপশন ও ওষুধ সঙ্গে রাখুন।
- কর্তব্যরত চিকিৎসককে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করতে সাহায্য করুন।
- যেহেতু নাকের রক্তপাত বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে হতে পারে, তাই চিকিৎসাও রোগীবিশেষে পৃথক (Individualized) হবে। নাকের রক্ত বন্ধ করার প্রক্রিয়াগুলি বেদনাদায়ক হতে পারে, রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হতে পারে, প্রয়োজনে উচ্চতর চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠাতে হতে পারে।
- এই রক্তপাতের কারণ খুঁজতে গিয়ে রোগীর জটিলতর রক্তের রোগ বা টিউমার ধরা পড়তে পারে। তার যথাযথ চিকিৎসা করাতে হবে। রক্তপাত এইসব রোগীর ক্ষেত্রে রোগের উপসর্গ মাত্র, সেই উপসর্গ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলেই যদি চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে আসল রোগের চিকিৎসা হয় না, তাতে রোগীরই ক্ষতি। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসরণ করুন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সোনিয়া বেগম, এমবিবিএস, এমএস (পিজিটি), নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

বেডসোর

ভয়ানক অসুস্থ রোগী, জ্ঞান নেই। হাসপাতালে কিছুদিন থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন, বাড়ির সবার মুখে হাসি ফুটল। কিন্তু এ কী! পুরো সুস্থ তো নয়! যার জন্য হাসপাতালে গেছিলেন তিনি, সেটার সুরাহা হয়েছে বটে, কিন্তু পেছনে একটা বিশ্রী ঘা! বেডসোর! অনেকে বলেন, কই, আগেকার দিনে তো কথায় কথায় এতো হাসপাতাল-বদ্যি-নার্সিংহোম ছিল না, রোগী বাড়িতেই মরত বা বাঁচত, কিন্তু বেডসোর হতে তো দেখতাম না! তাহলে এখন হাসপাতালে ক-দিন থাকলেই বেডসোর হচ্ছে কেন? সস্তার থেকে ফাইভ স্টার—কোনো হাসপাতালে গেলেই কি এর হাত থেকে রেহাই নেই? আমাদের মনে হয়, না, সত্যিই রেহাই নেই। বেডসোর ঠেকানোর জন্য রোগীর ভালো করে দেখাশোনা যতটা দরকার, সাধারণত ডাক্তারি দক্ষতা ততটা দরকার নয়। রোগীর ওপর ভালোবাসা থাকলে বেডসোর হওয়া প্রায় ক্ষেত্রেই আটকানো যায়। যত পয়সাই ফেলুন না কেন, ভালোবাসা এখনও কেনা যায় না। আমেরিকা-ইউরোপে ভালোবাসার ঘাটতি খানিকটা অন্তত পুষিয়ে দিয়েছে পেশার প্রতি নিষ্ঠা ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ, কর্ম-সংস্কৃতি। এখানে সে সব নেই। সুতরাং নিজের বা প্রিয়জনের বেডসোর নিজেই ঠেকান। ব্রিটেনের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বেডসোর আটকাতে আর তার চিকিৎসা করতে যে গাইডলাইন আছে, সেই গাইডলাইন অনুসারে বেডসোরের ব্যাপারে ডাক্তারি তথ্য এখানে দেওয়া হল, সেটা আপনার বাড়িতেও অনুসরণ করা অনেকটা সম্ভব। কী করে বেডসোর ঠেকাবেন, লিখেছেন **ডা. জয়ন্ত দাস**। পড়ুন, আর নিজের/প্রিয়জনের বেডসোর নিজেই আটকান।

অরুণা শানবাগকে মনে পড়ে? ধর্ষণের শিকার এই নার্স ১৯৭৩ থেকে ২০১৫—এই ৪২ বছর ধরে মুম্বাইয়ের কেইএম হাসপাতালের বিছানায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিলেন। তাঁর বন্ধু পিঙ্কি ভিরানি আদালতে ২০১০ সালে আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁকে বাঁচানোর পথ নেই যখন তখন কষ্ট না দিয়ে মৃত্যু (euthanasia)-র অনুমতি দেওয়া হোক। অনুমতি পাওয়া যায়নি। অরুণার সহকর্মী নার্সরা এই আবেদনের বিরোধিতা করেন। আদালতের এই রায়ের ৫ বছর পরে অরুণা ৬৬ বছর বয়সে মারা যান। সে বৃত্তান্ত *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যায় (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০১৫) ছাপা হয়েছিল।

বেডসোর লিখতে বসে হঠাৎ অরুণার কথা কেন? 'ধান ভানতে শিবের গীত' এইজন্যই যে দীর্ঘ ৪২ বছর অচৈতন্য থেকেও অরুণার বেডসোর হয়নি। অথচ আমরা আকচার দেখি, অচৈতন্য রোগী দু-সপ্তাহ হাসপাতালে কাটালেই তাঁর বেডসোর হচ্ছে। অরুণার হয়নি, কেননা তাঁর সহমর্মী নার্সরা তাঁকে পরম মমতায় যত্নে রেখেছিলেন। এইটা মাথায় রেখে আমরা বেডসোরের কারণ ও চিকিৎসা নিয়ে আলোচনায় যাব।

শয্যাশায়ী বা হুইলচেয়ার-বন্দি রোগীদের বড়ো বিপদ হল বেডসোর। অনেকদিন ধরে একজায়গায় চাপ পড়েই সাধারণ বেডসোর হয়। প্রথম পর্যায়ে বেডসোরে কেবল চামড়ায় লালচে বা কালচে দাগ দেখা যায়। ঠিকঠাক যত্ন না নিলে ওই দাগটাই খোলা 'ঘা'-তে পরিণত হয়, ক্রমশ গভীর হয়। তখন বিপদ। রোগীর শরীর যেখানটায় বিছানা বা হুইলচেয়ারে ঘষা খায়, সেখানেই সাধারণত বেডসোর হয়। যেমন শয্যাশায়ী রোগীর শিরদাঁড়ার নীচের দিকে, কাঁধ ও কাঁধের নীচে, কনুইতে। হুইলচেয়ার-বন্দির বেডসোর হয় পাছায় ও হাত আর পায়ের পেছনদিকে। চাপ পড়লেই

সবার বেডসোর হয় না। বৃদ্ধ রোগী হলে, প্রস্রাব-পায়খানা ধরে রাখতে অসুবিধা থাকলে, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগ থাকলে, রোগী অচেতন হলে, বেডসোর সহজেই হবে। একবার ঘা হলে, বিশেষ করে ঘা গভীর হয়ে গেলে, সংক্রমণ হয়ে বেডসোর বাড়ে, এবং সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে প্রাণসংশয়ও হতে পারে।

সামান্য যত্ন, বোডসোরের লক্ষণ দেখা গেল কিনা সেটা রোজ দেখা, সুষম খাদ্য, রোগীকে সময়মতো পাশ ফেরানো, ঘষা লাগার জায়গায় ব্যান্ডেজ ও বিশেষ গদি—এসব দিয়েই প্রায় সব ক্ষেত্রে এই রোগ আটকানো যায়, ও অল্প বেডসোরকে সারানোও যেতে পারে। কিন্তু একবার বেডসোর হয়ে গেলে চিকিৎসার হ্যাপা অনেক। বিশেষ ড্রেসিং থেকে ফিজিয়োথেরাপি থেকে অপারেশন—সব কিছুই দরকার হতে পারে। বেডসোর হবেই না, এটা সর্বোচ্চস্তরের যত্ন করলেও জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু তার সম্ভাবনা ভীষণভাবেই কমানো যায়।

বেডসোর কাকে বলে?

বেডসোর হল ত্বক ও তার তলাকার কোষকলা নষ্ট হয়ে যাবার ফলে তৈরি হওয়া ঘা। টানা চাপে থাকার ফলেই এটা হতে পারে।

'ঘা' মানেই তা দগদগে রস-কাটা কিছু হবে, তা নয়। প্রথম পর্বে বেডসোর মানে চাপের জায়গায় খানিকটা লালচে বা কালচে বাদামি ভাব। তখন যত্ন নিলে সহজে সেরে যায়। কিন্তু ঠিকঠাক যত্ন না নিলে, বা রোগীর দুরারোগ্য কোনো সমস্যার জন্য বেডসোর হলে, যত্ন না নিলে ওই দাগটাই খোলা 'ঘা'-তে পরিণত হয়, আর ক্রমশ গভীর হয়, ফলে চর্বি, মাংস, এমনকী হাড় পর্যন্ত দেখা যায়। যত্ন না নিলে এটা পাশের দিকেও ছড়াতে থাকে।

চিত্র ১. শয্যাশায়ী রোগীর বেডসোরের সম্ভাব্য স্থান

কোথায় বেডসোর হয়?

শরীরের যেখানটা বিছানা বা হুইলচেয়ার ইত্যাদির সরাসরি সংস্পর্শে থাকে, সেখানটায় বেডসোর হয়। তবে সেখানে চর্বির আস্তরণ থাকলে সেটা অনেকটা সুরক্ষা দেয়। তাই শয্যাশায়ী রোগীদের পাছায় সাধারণত বেডসোর হয় না; হয় পাছার একটু ওপরে, শিরদাঁড়ার নীচের দিকে যে অংশটায় হাড় আর চামড়ার মাঝখানে তেমন পুরু চর্বি বা মাংসের আস্তরণ থাকে না, সেইখানে।

যদি আপনি শয্যাশায়ী হন, তো যেখানে যেখানে বেডসোর হতে পারে সেই জায়গাগুলো হল—

- কাঁধ ও কাঁধের নীচে 'স্ক্যাপুলা' বলে চ্যাপটা তেকোনা হাড়টার ওপরের চামড়ায়
- কনুইতে
- হাতের পাতার পেছন দিকে
- কানের প্রান্তে নরম হাড়ের (তরুণাস্থি) ওপরে
- হাঁটু, গোড়ালি, গোড়ালির ওপরদিকে হাড়ের ওপরে, পায়ের আঙুলে
- শিরদাঁড়ার ওপর
- শিরদাঁড়ার নীচের দিকে তেকোনা হাড়ের (স্যাক্রাম) ওপর (এটা আগেই বলেছি)।

আপনি যদি হুইলচেয়ারে বন্দি হন তো আপনার বেডসোর হতে পারে—

- পাছায় (বসে থাকলে এখানে চাপটা অনেক বেশি পড়ে, তাই চর্বির স্তর ক্ষতি আটকাতে পুরো কার্যকর হয় না)
- হাত আর পায়ের পেছনদিকে
- পাছার হাড়ের (পেলভিক বোন) পেছনে

বেডসোর কতটা বেড়েছে?

আগেই বলেছি, সব বেডসোর সমান নয়; কোনোটা অল্প, প্রথম পর্যায়ের, কোনোটা আবার বেশি, তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ের। এর প্রাবল্য মাপার চালু পদ্ধতি ইউরোপ থেকে আমদানি করা (European Pressure Ulcer Advisory Panel-EPUAP) গ্রেডিং।

প্রথম পর্যায়

এটা সবথেকে অল্প, শুরুর ধাপ; ঘা হিসেবে খুব কম গভীর, যাকে আমরা চলতি বাংলায় 'ঘা' বলিই না। এতে চামড়াটার রং বদলে যায়। আমাদের বাদামি চামড়ায় এটা খানিকটা লালচে, বা কালচে বাদামি, দেখায়; খুব ফর্সা চামড়ায় অবশ্য লাল দেখাবে। চাপ দিলে সেখানটা সাদা হয়ে যায় না, তবে জায়গাটা হাতে শক্ত অথবা স্পঞ্জের মতো লাগতে পারে, হাতে একটু গরম ঠেকতে পারে। দৃশ্যমান 'ঘা' থাকে না। তবে একটু চুলকানি বা অল্প ব্যথা থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়

এই পর্যায়ে খোলা ঘা দেখা যায়, তবে সেটা তেমন গভীর নয়। চামড়ার ওপরের অংশ (এপিডারমিস) বা বড়োজোর চামড়ার নীচের অংশের অল্প কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে অগভীর ঘা দেখা যায়; কখনো-সখনো ফোস্কার মতোও লাগতে পারে।

তৃতীয় পর্যায়

এই পর্যায়ে চামড়ার সবগুলো স্তর নষ্ট হয়ে উঠে যায়। চামড়ার তলার কোষকলার কমবেশি ক্ষতি হয়, তবে সেটা চামড়ার নীচের চর্বির স্তর পর্যন্তই, তার নীচের মাংসপেশি বা হাড়ের ক্ষতি হয় না। ঘা-টাকে খানিকটা গভীর গর্তের মতো দেখায়।

চতুর্থ পর্যায়

চামড়ার প্রবলতম ক্ষতি হয়, ঘা-এর চারদিকের কোষকলার মৃত্যু হতে থাকে, আর ঘা-এর গভীরে মাংসপেশি ও হাড় পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চতুর্থ পর্যায়ের বেডসোর হলে প্রবল সংক্রমণ ও তা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা জোরদার থাকে।

কেমন করে বেডসোর হয়?

অল্প জায়গায় খানিকটা চাপ যদি বেশিক্ষণ ধরে পড়ে তো বেডসোর হতে পারে, আবার অল্প জায়গায় খুব বেশি চাপ যদি অল্পক্ষণ পড়ে তা হলেও বেডসোর হতে পারে।

চাপ বাড়লে কী হয়? চাপের ফলে চামড়ায় রক্তবাহী নালীগুলোয় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে চামড়া অক্সিজেন ও খাদ্য পায় না। কিছুক্ষণ এরকম চললে চামড়ার কোষগুলো মরে যায়। এটাই ঘা তৈরি হবার প্রথম ধাপ।

এটুকু বোঝা যাচ্ছে যাঁরা বিছানা বা হুইলচেয়ারে আবদ্ধ, তাঁদের একই জায়গায় অনেকক্ষণ ধরে চাপ পড়ে, ফলে বেডসোর হয়। কিন্তু চাপ পড়লেই কি বেডসোর হবার সম্ভাবনা সবার সমান? না, তা নয়, সবার একই রকম সহজে বেডসোর হয় না। যদি রক্ত চলাচল রোগের কারণে আগে থেকেই কম থাকে, তো বেডসোর সহজেই হবে, যেমন ডায়াবেটিস থাকলে রক্তনালীগুলো আগেভাগেই ক্ষতিগ্রস্ত থাকে, ফলে ডায়াবেটিস রোগীদের অপেক্ষাকৃত সহজে বেডসোর হবে।

বেশিক্ষণ বেশি চাপে কীভাবে ঘা হয়?

চাপে রক্তনালীর মধ্যে রক্ত চলাচল না করার ফলে অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টিদ্রব্য চামড়ায় পৌঁছোতে পারে না, যেমন আগেই বলেছি। এর ফলে কোষ মারা যায়। আবার, রক্তের মধ্যে দিয়েই জীবাণু সংক্রমণ আটকানোর জন্য দরকারি শ্বেত রক্তকণিকা আসে, সেগুলো আর ঠিকঠাক আসতে পারে না। তাই একবার ঘা হয়ে গেলে, সহজেই জীবাণু সংক্রমণ হয়, ঘা সারে না, বরং আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু আমরা তো ঘুমের সময় একটা জায়গায় অনেকক্ষণ চাপ দিয়ে শুই, আমাদের বেডসোর হয় না কেন? আসলে ঘুমের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারেই আমাদের দেহ হাজার বার নড়াচড়া করে, ফলে একই জায়গায় খুব বেশি সময় চাপ পড়ে না। যারা খুব 'শান্ত হয়ে' ঘুমোন, তাঁরাও এক রাত্রে মোটামুটি কুড়িবার অবস্থান বদলান।

বেডসোর হতে সাহায্য করে—

- শক্ত জিনিসের চাপ—যেমন বিছানা বা হুইলচেয়ার।
- পেশির অনৈচ্ছিক সংকোচন—যেমন পেশিতে খিঁচ লাগা।
- অতিরিক্ত আর্দ্রতা, যেটা চামড়ার ওপর স্তরে সহজে ঘা হতে দেয়।

বেডসোর হতে কতটা সময় লাগবে তা নির্ভর করে—

- চাপের জোর
- চামড়ার সহ্যক্ষমতা

পরিস্থিতি তেমন থাকলে বেডসোরের তৃতীয় পর্যায় বা এমনকী চতুর্থ পর্যায় বেশ তাড়াতাড়িই এসে যেতে পারে। কোনো দুর্বল চামড়ার ওপর জোরে চাপের ফলে বেডসোরের তৃতীয়-চতুর্থ পর্যায় এক-দু ঘণ্টার মধ্যেও হতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষতিটা দৃষ্টিগোচর হবার মতো হয়ে উঠতে আঘাতের পরে দু-চারদিন লেগে যেতে পারে।

বেডসোরের ঝুঁকি বাড়ে কীসে?

অনেকগুলো রোগ বা অবস্থা বেডসোরের ঝুঁকি বাড়ায়। তাদের মধ্যে প্রধান হল—

- **নাড়াচড়ায় অসুবিধা**—যা কিছু আপনার শরীরকে স্বাভাবিক নাড়াচড়ায় বাধা দেয় তাই বেডসোরের ঝুঁকি বাড়ায়।
- **পুষ্টির অভাব**—যথাযথ খাবারের অভাব বা হজম করার অক্ষমতা থাকলে চামড়াকে দুর্বল করে দেয়।
- **ভেতরকার রোগ**—যেমন ডায়াবেটিস; এইসব রোগে চামড়া আঘাত সহ্য করতে পারে না।
- **বয়স**—৭০ বছরের ওপর বয়সে চামড়া ও তার রক্তপ্রবাহ দুই-ই কমজোরি হয়ে যায়
- **প্রস্রাব ও পায়খানা ধরে রাখার অক্ষমতা** থাকলে প্রস্রাব-পায়খানা লেগে চামড়া কমজোরি হয়ে যায়।
- **গুরুতর মানসিক রোগ**।

এদের অনুপুঙ্খ আলোচনা করা দরকার।

নাড়াচড়ায় সমস্যা

নাড়াচড়ায় সমস্যার সাধারণ কারণগুলো হল—

- মেরুদণ্ডে আঘাতের কারণে হাত বা পা বা দুয়েরই পক্ষাঘাত।
- স্ট্রোক (মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবার জন্য সেখানকার কোষের মৃত্যু) বা বড়ো ধরনের মাথার আঘাত—এর ফলে অজ্ঞান থাকা।
- যেসব রোগে দেহের নানা অংশ নাড়াবার স্নায়ুগুলো ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়—যেমন এলজেহাইমার রোগ, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস বা পার্কিনসন্স রোগ।
- প্রচণ্ড ব্যথা যাতে শরীরের অংশবিশেষ বা পুরো শরীরটাই নাড়াতে পারা যায় না।
- হাড়ভাঙা।
- অপারেশনের পরে বাধ্যতামূলক শয্যাবন্দি অবস্থা।
- কোমা (অচৈতন্য অবস্থা)।
- দেহের হাড় বা গাঁটগুলো নাড়ানোর সমস্যা হয় এমন অবস্থা, যথা রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস।

অপুষ্টি

অপুষ্টির সাধারণ কারণগুলো হল—

- খাদ্যের অভাব।
- কম জল খাবার ফলে ডিহাইড্রেশন।
- অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা—যে রোগে রোগীর নিজের ওজন কম রাখার জন্য অস্বাস্থ্যকর রকমের বাড়াবাড়ি করেন।
- গিলতে কষ্ট (কোনো রোগের কারণে)।

সাধারণ স্বাস্থ্যের দুরবস্থা

সাধারণ স্বাস্থ্যের দুরবস্থার যেসব সাধারণ কারণে বেডসোর হবার সম্ভাবনা বাড়ে সেগুলো হল—

- টাইপ ১ ও টাইপ ২ ডায়াবেটিস—বেশি শর্করা রক্ত চলাচলের বাধার কারণ হতে পারে।
- ধমনির রোগ—এতে বিশেষ করে পায়ের রক্ত চলাচল কমে যায়।
- হার্ট ফেলিয়োর—ক্ষতিগ্রস্ত হৃদ্‌যন্ত্র শরীরের সর্বত্র ভালোভাবে রক্ত চালাতে পারে না।
- কিডনি (বৃক্ক) ফেলিয়োর—ক্ষতিগ্রস্ত কিডনি রক্তকে ভালোভাবে পরিশ্রুত করতে না পারার ফলে রক্তে নানা বিপজ্জনক টক্সিন জমা হয়, আর তাতে কোষকলার ক্ষতি হয়।
- শ্বাসনালী বাধাগ্রস্ত হবার দীর্ঘস্থায়ী অসুখ—কয়েকটা ফুসফুসের রোগে এমন হয়; এর ফলে রক্তে অক্সিজেন কমে যায়, আর চামড়া কম অক্সিজেন পাবার ফলে কমজোরি হয়ে যায়।

চামড়ায় বয়স বাড়ার প্রভাব

কেন বেশি বয়সে বেডসোর হবার প্রবণতা বাড়ে?

- বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার স্থিতিস্থাপকতা কমে, অর্থাৎ তা টানলে বেড়ে গিয়ে তারপর পুরোনো আকৃতিতে তত সহজে ফিরতে পারে না, ফলে সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- বয়স বাড়লে চামড়ায় এমনিতেই রক্ত চলাচল কমে।
- চামড়ার নীচে চর্বির 'কুশন' কমে যায়।

প্রস্রাব-পায়খানা ধরে রাখতে অসুবিধা

বয়স বাড়লেই প্রস্রাব-পায়খানা ধরে রাখতে অসুবিধা হতে পারে। ফলে চামড়ার নানা জায়গা ভিজে থাকে, আর ভিজে থাকলেই সেখানে সহজে নানা সংক্রমণ হয়। এর ওপর যদি শয্যা বা চেয়ারের চাপ পড়ে, সহজে বেডসোর শুরু হয়।

মানসিক রোগের সমস্যা

স্কিৎজোফ্রেনিয়া জাতীয় উন্মাদ রোগে, বা খুব ডিপ্রেশনে (অবসাদ, বিষাদরোগ) বেডসোর বেশি হয়। কারণগুলো সহজবোধ্য—

- খাওয়া ঠিকমতো হয় না।
- ডায়াবেটিস বা প্রস্রাব-পায়খানা ধরে রাখতে অসুবিধা—এসব রোগীর বেশি হবার সম্ভাবনা।
- এঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত যত্ন নিতে পারেন না বা নেন না, ফলে চামড়ায় আঘাত লাগা ও সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা বাড়ে।

চাপ লাগার ধরন

মোটের ওপর তিনরকম চাপ থেকে বেডসোর হতে পারে, আর তাই বেডসোরের আরেক নাম 'প্রেসার আলসার' বা 'চাপজনিত ঘা'। তিনরকম চাপ বলতে—

একটা জিনিস অন্যটার ওপরে থাকার জন্য চাপ—যথা বিছানা বা চেয়ারে দেহ থাকার জন্য চাপ।

দোমড়ানো-মোচড়ানোর চাপ—যখন এক জায়গার চামড়া অন্য জায়গার চামড়ার সঙ্গে ঘষে যায়, বা চামড়া তার তলার কোষকলার ওপরে ঘষে যায়; যখন কেউ বিছানা বা হুইলচেয়ার থেকে ঘষটে নামে বা ওঠে তখন এরকম হয়।

দুটো জিনিসের ঘষার চাপ—যেমন বিছানার চাদর বা কড়া জামাকাপড় চামড়ার ওপর ঘষে গেলে হয়।

কার বেডসোর হয়?

এদেশের পরিসংখ্যান পাইনি। ব্রিটেনে প্রতিবছর ৫ লক্ষ মানুষের অন্তত একবার বেডসোর হয়। তবে সবার সমান হারে হয় না; যাদের কোনো ভেতরকার দীর্ঘমেয়াদি রোগ আছে, বা বয়স বেশি, বা অচৈতন্য হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, তাঁদের বেডসোর হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

বেডসোরের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

একবার বেডসোর হলে চিকিৎসার হ্যাপা অনেক। ক্ষত পরিষ্কার করে দরকার মতো মলম লাগানো বা ব্যান্ডেজ করতে হয়। এমনভাবে রোগীকে রাখতে হয় যে একজায়গায়, বিশেষ করে ক্ষতের ওপর, চাপ না পড়ে। খুব গুরুতর ক্ষেত্রে অপারেশন করতে হয়, কিন্তু অপারেশনের পরে খুব যত্ন নেওয়া দরকার। অল্প বা খুব অগভীর ক্ষত, রোগীর তেমন গুরুতর অন্য রোগ বা ঝুঁকি, যেমন ডায়াবেটিস, প্রস্রাব-পায়খানা ধরে রাখতে অসুবিধা, পক্ষাঘাত, বেশি বয়স—এসব নেই, তাঁদের একটু ভালোভাবে নার্সিং বা সেবা করলেই বেডসোর সেরে যায়। অন্যদিকে, গভীর ক্ষত এবং/অথবা ওইসব রোগ বা ঝুঁকি যাঁদের আছে তাঁদের রক্তে জীবাণু সংক্রমণ, গ্যাংগ্রিন, এসব সহজেই হতে পারে।

সবচেয়ে সেরা চিকিৎসা পেলেও তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের বেডসোরে কিছু না কিছু জটিলতা হতেই পারে, আর তার থেকে এমনকী মৃত্যুও হতে পারে।

বেডসোরের কয়েকটি জটিলতা হল:

সেলুলাইটিস

বেডসোরের জায়গা থেকে গভীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে—চামড়ার নীচের স্তরে এই সংক্রমণকে বলে সেলুলাইটিস। এতে ব্যথা ও লালভাব হয়, আর জায়গাটা ফুলে যায়। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এর চিকিৎসা হয়। সময়ে সঠিক চিকিৎসা না হলে সংক্রমণ রক্তে ছড়িয়ে পড়ে ও সেপ্টিসিমিয়া হয়। সংক্রমণ চামড়ার নীচের হাড় বা গাঁটেও ছড়িয়ে যেতে পারে, আর বিরল ক্ষেত্রে, পাছার হাড়ের ওপর বেডসোর হলে সুষুম্না কাণ্ড ও মস্তিষ্কের চারধারের পর্দায় সংক্রমণ ছড়িয়ে যায়—তখন মেনিনজাইটিস হয়।

রক্তে সংক্রমণ ছড়ানো

অনেক বেডসোর রোগীরই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে, আর তাঁদের যদি বেডসোর সংক্রামিত হয়ে যায় তো সেই সংক্রমণ রক্ত বা অন্য জায়গায় ছড়ানোর সম্ভাবনা বেশি। রক্তে জ্যান্ত জীবাণু বংশবৃদ্ধি করছে, এমন অবস্থাকে বলে সেপ্টিসিমিয়া, আমরা বাংলায় বলি 'সেপটিক হওয়া'। সেপ্টিসিমিয়ার বাড়াবাড়ি হলে দেহের অনেক প্রত্যঙ্গে সংক্রমণ হয়ে সেগুলোর নানা ক্ষতি হয়, আর রক্তচাপ মারাত্মক রকম কমে যায়। তাতে মৃত্যু হতে পারে। সেপ্টিসিমিয়ায় রক্তচাপ কম হবার লক্ষণ হল ঠান্ডা চামড়া আর হৃদ্‌যন্ত্র তথা নাড়ির দ্রুত গতি। সেপ্টিসিমিয়া একটা ইমার্জেন্সি অবস্থা। ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট-এ এই রোগীর চিকিৎসা করতে হবে, যাতে অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি দিয়ে জীবাণু মারা শেষ হওয়া পর্যন্ত রোগীর অকেজো প্রত্যঙ্গগুলোর খানিকটা সহায়তা করা যায়।

হাড় ও গাঁটে সংক্রমণ ছড়ানো

বেডসোর থেকে সংক্রমণ রোগীর সংক্রমণ গাঁট বা অস্থিসন্ধিতে পৌঁছে গেলে হয় সেপটিক আর্থ্রাইটিস, আর সংক্রমণ হাড়ে পৌঁছে গেলে হয় অস্টিওমাইলাইটিস। এ-দুটোতেই তরুণাস্থি, হাড় ও অন্যান্য কোষকলার মৃত্যু হয়ে গাঁট বা হাত-পা ইত্যাদির স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি তো লাগেই, এমনকী হাড় ও গাঁটের অপারেশন করতে হতে পারে।

নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস

পরিচিত নাম নয় একেবারেই, কিন্তু বেডসোরের একটা বড়ো বিপদ। চামড়ার একটা ভয়ানক সংক্রমণ, বাংলায় বলা যায় 'মাংসখোর জীবাণু'-র আক্রমণ। গ্রুপ-এ স্ট্রেপটোকক্কাস নামের জীবাণু সংক্রমণ থেকে দ্রুত কোষকলার মৃত্যু হয়। এর ইমার্জেন্সি চিকিৎসা দরকার—অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদির সঙ্গে অপারেশন করে মৃত কোষকলা কেটে বাদ দিতে হয়।

গ্যাস গ্যাংগ্রিন

মারাত্মক কিন্তু বিরল সংক্রমণ। বেডসোরে ক্লস্টিডিয়াম ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণের ফলে এটা হতে পারে। অক্সিজেন কম আছে এমন জায়গায় এই ব্যাকটিরিয়া বাড়ে, আর গ্যাস ও মারাত্মক টক্সিন তৈরি করে। ফলে খুব দ্রুত ভয়ানক ব্যথা আর ফোলা দেখা যায়। চটপট অপারেশন করে সংক্রামিত

কোষকলা বাদ দিতে হয়, অনেক সময়ে হাত-পা ইত্যাদি সংক্রামিত অঙ্গও বাদ দিতে হয়।

বেডসোর প্রতিরোধ

বেডসোর তথা প্রেসার আলসার চিকিৎসা করে সারানো খুব শক্ত হতে পারে। তাই এই ঘা আটকানোর নানা পদ্ধতি নেওয়া উচিত। তাদের মধ্যে প্রধান হল—

রোগীর অবস্থান নিয়মিত পালটানো

যেখানে বেডসোর হতে পারে সেখানে বিশেষ জিনিস ব্যবহার করা, যেমন বিশেষ ধরনের ম্যাট্রেস (তোশক) ও গদি।

বেডসোর আটকানোর প্রথম ধাপ সহজ। রোগীর অবস্থান নিয়মিত পরিবর্তন করা, যাতে তার শরীরের চাপ সবসময় একই জায়গায় না পড়ে। আর বিশেষ তোশক বা গদি (যথা এয়ার ম্যাট্রেস) থাকলে খুব সুবিধা হয়। ঘা হলে তা ঠিক সময়মতো ধোয়া ও দরকারে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া, ও কিছু ক্ষেত্রে সময়ে অপারেশন করা বড়ো ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

বেডসোরের হাত থেকে বাঁচতে যাঁদের সহায়তা চাই

অনেকগুলো পরস্পর সম্পর্কিত বিষয় থেকে বেডসোর হয়, তাই নানা ধরনের স্বাস্থ্যকর্মী ও ডাক্তারের মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। মেডিসিন ও সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স, ডায়েটিশিয়ান, ফিজিয়োথেরাপিস্ট, পেশাগত কাজের ব্যাপারে থেরাপিস্ট ও সোশ্যাল ওয়ার্কার—দলে এঁদের দরকার। এটা হল ব্রিটেনের ব্যবস্থা। আমাদের দেশে এরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বললেই চলে। খুব উঁচুমানের সরকারি হাসপাতালে এর তুল্যমূল্য কিছু থাকতেও পারে, পশ্চিমবঙ্গের কোনো সরকারি হাসপাতালে এতসব নেই। আর খুব নামি-দামি বেসরকারি হাসপাতালেও এসব নেই, কেননা সেখানে রোগী আসে হাসপাতালের চাকচিক্যে আর ডাক্তারের নামডাকে, সেখানে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স, ফিজিয়োথেরাপিস্ট, সোশ্যাল ওয়ার্কার—এতসব নিয়ে কাজ করে টাকার অঙ্কে লাভ কী?

রোগীর শরীরের অবস্থানের পরিবর্তন

যেখানে বেডসোর হয়েছে, বা হবার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে চাপ যাতে কম পড়ে, সেটা দেখতে হবে। শরীরকে নিয়মিত সরানো-নাড়ানো, ও একপাশ থেকে অন্যপাশে কাত করে দেওয়ার মতো অবস্থানের পরিবর্তন—এতে বেডসোর হবার সম্ভাবনা কমে, আর বেডসোর হলে তা তাড়াতাড়ি সারার সম্ভাবনা বাড়ে।

একবার রোগীর অবস্থা ভালো করে বুঝে নিয়ে রোগীর চিকিৎসাকারীরা দল হিসেবে 'শরীর নাড়ানোর টাইমটেবিল' তৈরি করে ফেলবে। তাতে বলা থাকবে রোগীকে কতক্ষণ অন্তর এদিক-সেদিক নড়াতে হবে—সেটা এমনকী ১৫ মিনিট অন্তর পাশ ফেরানোও হতে পারে, আবার দু-ঘণ্টা অন্তরও হতে পারে। চিকিৎসাকারীরা দেখবেন যে বেডসোর হবার সবচেয়ে সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে যেন সবচেয়ে কম চাপ পড়ে।

হাসপাতালে চিকিৎসা হোক, বা তা হোক বাড়িতে, চিকিৎসক-দল বলে দেবেন—

- রোগীর উপযুক্ত বসা ও শোয়ার কায়দা।
- কতক্ষণ অন্তর তাঁর অবস্থান বদলাতে হবে।
- কতক্ষণ অন্তর তাঁকে নাড়াতে হবে, আর সেটা কেমন করে।
- পা-এর সাপোর্ট দেবার সবচেয়ে ভালো কায়দাটা কী।
- দেহের সঠিক অবস্থান বজায় রাখার জন্য কী করণীয় (যেমন প্রয়োজনে বালিশের সাপোর্ট)।
- (এয়ার ম্যাট্রেস জাতীয়) কোন বিশেষ জিনিস দরকার ও তা কেমন করে ব্যবহার করতে হয়।

ম্যাট্রেস ও কুশন

অনেক রকমের বিশেষ ম্যাট্রেস ও কুশন আছে যাতে বেডসোর হবার জায়গাগুলোয় চাপ কম পড়ার ব্যবস্থা হয়। রোগীর অবস্থা বুঝে সেটা বেছে নিতে হবে।

যাদের বেডসোর হবার সম্ভাবনা তাদের বিশেষ ফোম ম্যাট্রেস কাজের হতে পারে। আর তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ের বেডসোর যাদের হয়ে গেছে, তাঁদের আরও বিশেষ ধরনের ম্যাট্রেস লাগবে। এয়ার ম্যাট্রেস ভালো, আরও ভালো হয় যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্যাট্রেসের ভেতরের চাপ নিয়ন্ত্রণ করার মতো ব্যবস্থা থাকে।

ড্রেসিং ও ব্যান্ডেজ

বিশেষভাবে তৈরি ড্রেসিং ও ব্যান্ডেজ বেডসোর-আক্রান্ত স্থানকে সুরক্ষা দিতে ও সারিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের 'ড্রেসিং'-গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- **হাইড্রোকলয়েড ড্রেসিং**—এতে এক ধরনের বিশেষ 'জেল' থাকে যা ঘা-এর মধ্যে নতুন ত্বককোষের গঠন করতে সুবিধা দেয়, আর চারিপাশের সুস্থ চামড়াকে শুকনো রাখে।
- **এলজিনেট ড্রেসিং**—সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে প্রস্তুত এই ড্রেসিং-এ সোডিয়াম ও ক্যালশিয়াম ঘা শুকোতে সাহায্য করে।

ক্রিম ও অয়েন্টমেন্ট

লাগানোর ক্রিম ও অয়েন্টমেন্ট বেডসোর তাড়াতাড়ি সারাতে সাহায্য করে, আর তা ছড়িয়ে পড়তে বাধা দেয়।

অ্যান্টিবায়োটিক

বেডসোর থাকলেই যে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে বা ইঞ্জেকশন দিতে হবে তা নয়। বেডসোরে সংক্রমণ থাকলে তবেই অ্যান্টিবায়োটিক লাগে, যাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে। অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম ইত্যাদিও বেডসোরের মধ্যেকার জীবাণু মারার জন্য দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনো ওষুধ দেবার বিধানই ডাক্তার ছাড়া অন্য কেউ দেবেন না।

পুষ্টি

কিছু কিছু খাদ্য কম পরিমাণে খেলে বেডসোর সারতে দেরি হয়—যথা প্রোটিন, জিঙ্ক, ভিটামিন 'সি'; এগুলো খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে চামড়ায় বেডসোর সহজে হয়। এই বেডসোর হলে, বা তা হবার সম্ভাবনা

থাকলে, একজন ডায়েটিশিয়ান রোগীকে কী কী খেতে হবে সেটার পরিকল্পনা করে দিলে ভালো হয়।

স্থানীয় মৃত কোষকলা বাদ দেওয়া

ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলে 'ডিব্রাইডমেন্ট'। অল্প পরিমাণে মৃত কোষ থাকলে অপারেশন না করে, কেবল বিশেষভাবে ড্রেসিং করে ও মলম লাগিয়েই অনেকটা ডিব্রাইডমেন্ট করা যায়। কিন্তু বেশি মৃত কোষকে বাদ দিতে গেলে নানা মেকানিক্যাল ও সার্জিক্যাল পদ্ধতির দরকার হয়।
পরিষ্কার করা ও সজোর জলধারায় মৃত কোষ সরানো।
আল্ট্রাসাউন্ড-রে দিয়েও মৃত কোষকে সারানো যায়।
লেসার—এক বিশেষ ধরনের আলোকরশ্মি ব্যবহার করে মৃত কোষকে সরানো।
অপারেশন করে কোষকলা বাদ দেওয়া—এখানে সার্জেনের ছুরি লাগে। সাধারণত স্থানীয় অবেদন (অ্যানাসথেশিয়া)-এর সাহায্যে জায়গাটা অসাড় করে ডিব্রাইডমেন্ট করা হয়; রোগীর ব্যথা বা অসুবিধা তেমন হয় না।

ম্যাগট (মাছি ইত্যাদির লার্ভা দিয়ে চিকিৎসা)

'ডিব্রাইডমেন্ট'-এর একটা স্বীকৃত পদ্ধতি হল মৃত কোষকলাতে ম্যাগট-দের রাখা, যাতে তারা মৃত অংশগুলো খেয়ে ফেলতে পারে। এটা আমাদের দেশে তেমন চালু নয়।

স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত রোগীর শরীরের অবস্থান পরিবর্তন করা সবথেকে কাজের ব্যাপার। এতে বেডসোর না হয়ে থাকলে তা হওয়া আটকায়, আবার বেডসোর হয়ে থাকলে তার ওপর চাপ না পড়ার ফলে সারতে সুবিধা হয়।

সার্জারি

বেডসোর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে চলে গেলে তা অন্যভাবে সারা সম্ভব না হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্ষত যাতে আর না বাড়তে পারে সে জন্য সার্জারি বা অপারেশন করতে হয়। এইরকম অপারেশনে সাধারণত সার্জন তাঁর ছুরি, ফরসেপস ইত্যাদির সাহায্যে ক্ষতটির মৃত কোষকলা বাদ দিয়ে সেটি পরিষ্কার করে দেন। তারপর ক্ষতের দুইপাশের চামড়া জুড়ে ক্ষতটি বন্ধ করে দেন।

সবসময় ক্ষতস্থানের দু-পাশ থেকে চামড়া টেনে জোড়া যায় না। তখন কাছাকাছি কোনো জায়গার চামড়া টেনে এনে জোড়া হয়—পরিভাষয় একে বলে 'ফ্ল্যাপ রিকনস্ট্রাকশন।'

বেডসোরের ওপর অপারেশন করে ক্ষত ঢাকা সোজা ব্যাপার নয়, বিশেষ করে এইজন্য যে বেডসোরের রোগীদের দেহ অন্য রোগে কাবু হয়েই থাকে। অপারেশনের পর নানারকম জটিলতা হতে পারে। সেগুলো হল—

চিত্র ২. তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ের বেডসোর ও তা সারানোর জন্য অস্ত্রোপচার

- জীবাণু সংক্রমণ
- অন্য জায়গার চামড়া টেনে জোড়া হলে, সেই চামড়ার কোষকলার মৃত্যু
- পেশির দুর্বলতা
- ফোস্কা পড়া
- বেডসোর ফিরে আসা
- সেপটিক (দেহের রক্তে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি)
- হাড়ের ভেতরে সংক্রমণ
- দেহের ভেতর রক্তক্ষরণ
- দেহের ভেতরে পুঁজ জমা (অ্যাবসেস)
- পায়ের গভীর শিরার মধ্যে রক্ত জমা (ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস)

এই সব ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, অনেক সময় সেপটিক, গ্যাংগ্রিন ও অন্যান্য মারক জটিলতার হাত থেকে বাঁচতে অপারেশন ছাড়া গতি থাকে না।

প্রতিরোধই শ্রেষ্ঠ উপায়

প্রত্যেক রোগীর অবস্থা অনুযায়ী বেডসোর প্রতিরোধের পরিকল্পনা করতে হবে, আর রোগীর চিকিৎসায় যুক্ত চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর দল সেই পরিকল্পনা করবেন। বিশেষ করে বাড়িতে থাকা রোগীর জন্য রোগীর বাড়ির লোকের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার বাড়িতে যদি বেডসোরের রোগী থাকে তো নীচের সাধারণ নিয়মগুলো আপনার কাজে লাগবে।

শরীরের অবস্থান পরিবর্তন

স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত রোগীর শরীরের অবস্থান পরিবর্তন করা সবথেকে কাজের ব্যাপার। এতে বেডসোর না হয়ে থাকলে তা হওয়া আটকায়, আবার বেডসোর হয়ে থাকলে তার ওপর চাপ না পড়ার ফলে সারতে সুবিধা হয়।

সাধারণভাবে বলা যায়, হুইলচেয়ারে বসা রোগীর ক্ষেত্রে প্রতি ১৫ মিনিট থেকে আধঘণ্টা অন্তর অবস্থান বদলাতে হয়। আর বিছানায় শুয়ে থাকলে প্রতি দু-ঘণ্টা অন্তর তার অবস্থান বদলাতে হয়।

একবার বেডসোর হয়ে গেলে সেই ক্ষতের জায়গায় চাপ না পড়ে এমন অবস্থানে রোগীকে রাখতে হবে; আবার অন্য জায়গায় যেন টানা চাপ না পড়ে সেটাও দেখতে হবে।

যদি রোগীর জন্য অতটা সময় দেবার উপায় আপনার না থাকে তো কোনো লোককে সে ব্যাপারে নিযুক্ত করতে হবে।

পুষ্টি

- স্বাস্থ্যকর সুষম খাদ্য, বিশেষ করে যাতে যথাযথ পরিমাণে প্রোটিন ও সব ধরনের ভিটামিন আর খনিজ দ্রব্য আছে, দরকার। তা চামড়ার ক্ষতি হওয়া আটকাতে ও ক্ষত নিরাময় করতে সাহায্য করে। এর জন্য ডায়েটিশিয়ান বা পুষ্টিবিশারদদের সাহায্য নিতে হতে পারে।
- যদি রোগীর রোগের কারণে খিদে কমে গিয়ে থাকে, তা হলে এই উপদেশগুলো মনে রাখা ভালো।
- সারাদিন ধরে অল্প অল্প করে খেয়ে যাওয়া; দু-তিনবারে বড়ো খাবারের চাইতে সেটা বেশি কাজের। খিদে পাবার জন্য অপেক্ষা করার চাইতে কখন খাওয়া হবে তার একটা 'টাইমটেবিল' তৈরি করা উচিত।
- খাবার আগে বেশি করে জল বা অন্য তরল কিছু না খাওয়াই ভালো।
- যদি খাবার গিলতে অসুবিধা থাকে তো স্যুপ ইত্যাদি তরল বা অর্ধতরল খাবার দেওয়া যায়।
- নিরামিষাশীদের ক্ষেত্রে, নিরামিষ খাদ্যেও যাতে সঠিক প্রোটিন পাওয়া যায় সেভাবে খাদ্য বাছাই করা উচিত; যেমন চিজ, বিনস, বাদাম ইত্যাদি।

চামড়া নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখা

যদি বেডসোরের সম্ভাবনা থাকে তো বেডসোরের লক্ষণ দেখা গেল কিনা সেটা দিনে একবার পরীক্ষা করা উচিত, আর সেটা বাড়িতেই করা যায়। প্রথম লক্ষণ হল (চাপের জায়গায়) কালচে বা লালচে ভাব। যদি ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো কারণে অসাড়ত্ব থাকে তো এখানে ব্যথা বা কোনো অনুভূতি হবে না, তাই পরীক্ষা করা আরও জরুরি। রোগী নিজেই নিজেকে পরীক্ষা করতে পারেন, যেখানে নজর চলে না সেখানে আয়না দিয়ে দেখতে হবে; কিন্তু পুরো শরীরেরই চামড়া দেখা চাই।

চিত্র ৩. এয়ার ম্যাট্রেস ব্যবহার ও নরম কুশনের সাহায্যে দেহের সঠিক অবস্থান বজায় রাখা

রোগী নিজে দেখে কিছু সন্দেহ করলে তাঁর যত্ন করছেন যাঁরা তাঁদের কাউকে দেখাবেন। পারিবারিক ডাক্তারকে ডাকা যেতে পারে। রোগী নিজেকে পরীক্ষা করার মতো অবস্থায় থাকলে হাসপাতালে বসেও তা করবেন, ও সন্দেহ হলে নার্স-ডাক্তারকে বলবেন।

ধূমপান ছাড়ুন

ধূমপায়ী হলে, ধূমপান ছেড়ে দেওয়া বেডসোর আটকানোর জন্য খুব কাজের পদক্ষেপ। ধূমপান করলে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে, আর দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে। ফলে বেডসোর হবার সম্ভাবনা বাড়ে।

এমনকী সর্বোচ্চস্তরের যত্ন করলেও বেডসোর হবে না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, বেডসোর হবার পর তার চিকিৎসা করার চাইতে সেটা ঠেকানোর চেষ্টা করাই ভালো, আর সেটার জন্য দারুণ যন্ত্রপাতি ডাক্তার-বদ্যির প্রয়োজন বিশেষ নেই, অনেক বেশি দরকার যত্ন করে রোগীকে দেখাশুনো করা।

সবশেষে, আবার অরুণা শানবাগ!

দ্য হিন্দু, ১৯ মে, ২০১৫, লিখছে—

কিং এডওয়ার্ড মেডিক্যাল মেমোরিয়াল (কেইএম) হাসপাতালে কাজ করতে আসা সব নার্সের কাছে গত ৪২ বছর ধরে অরুণা শানবাগ ছিল এক ছ-মাসের ছোট্ট বাচ্চা।

"ওই বয়সের এক বাচ্চার জন্য সবকিছু করেও মন ভরে কি? ওরকম বাচ্চাকে না ভালোবেসে তোমাদের কারও উপায় আছে? আমরাও কেবল বাচ্চাটাকে ভালোবাসতাম।" সুরিন্দার কউর, হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের প্রধান নার্স বললেন।

১৯৭৬ সালে নার্সিং ছাত্রী হিসেবে ওই হাসপাতালে ঢুকেছিলেন শ্রীমতী কউর। তখনই তিনি প্রথম জানতে পারেন, চার নম্বর ওয়ার্ডে অরুণা শানবাগ আধা-অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছেন।

"আমি কোনোদিন ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। কিন্তু আমি জানি উনি ডিমের তরকারি খেতে ভালোবাসতেন। ডিমের তরকারি ওঁর মুখে দিলে আনন্দের যে ছবি ফুটে ওঠে, সেটা আমি জীবনেও ভুলব না। উনি নাড়াচড়া করতে পারতেন না, কিন্তু পরিষ্কার বিছানার চাদর ছিল ওঁর ভারি পছন্দের, আর ওঁর ছোটো ছোটো দুই চোখ দিয়ে উনি নিজের খুশির কথা বুঝিয়ে দিতেন।" শ্রীমতী কউর আরও বলেন, "৪২ বছর হাসপাতালে শুয়ে ছিলেন অরুণা, ওঁর একটা বেডসোরও হয়নি।" **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ।

জলাশয় ও পরিবেশ রক্ষায় সাইকেল র‍্যালি: জলা বাঁচাও, জমি বাঁচাও, গাছ বাঁচাও

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরিবেশ-রক্ষা প্রাথমিক শর্ত। সাইকেল র‍্যালি করে যাঁরা সেই দাবিতে সরব হয়েছেন, তাঁরা একটা দরকারি কাজ করছেন। এরকম প্রচেষ্টা দিকে দিকে গড়ে উঠুক, আর আমাদের সরকার ও জনসাধারণ এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে পরিবেশ বাঁচান—এই আশা নিয়ে **‘বিজ্ঞান দরবার’**-এর এই রিপোর্ট প্রকাশ করছি। রিপোর্টটি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার-এর তরফে বিজ্ঞানকর্মী জয়দেব দে।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ রবিবার

বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে ১৪ ফেব্রুয়ারি সারাদিনব্যাপী জলাশয় ও পরিবেশ রক্ষায় এক সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। কাঁচড়াপাড়া স্টেশন থেকে এই র‍্যালি শুরু হয়। শুরুতে বিজ্ঞান দরবারের সম্পাদক সুরজিত দাস বলেন ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক স্টকহোম কনভেনশনে পৃথিবীর প্রায় সব কটি দেশের রাষ্ট্রনায়করা ঘোষণা করেছিলেন যে পৃথিবীর কোনো দেশই পরিবেশ, জল, বায়ু ও মাটি দূষণ করতে পারবে না। এ বিষয়ে তারা ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদ-বিশিষ্ট রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। পরিবেশ রক্ষার জন্য সব দেশই নিজ নিজ এলাকায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। ’৭২ সালের কনভেনশন থেকেই ৫ জুন বিশ্বপরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। পরিবেশ রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে প্রায় প্রতি বছরই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, অথচ আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখছি আমাদের চারপাশের জলাশয় ও পরিবেশ প্রতিনিয়ত বিপন্ন হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার জন্য আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি আইন রয়েছে যেমন—

> জল ধরো জল ভরো। জলাশয়ের পাখি বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য গাছ লাগানো দরকার।

দ্য এয়ার পলিউশন অ্যাক্ট (প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল) অ্যাক্ট ১৯৮১, দ্য ওয়াটার পলিউশন (প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল) অ্যাক্ট, ১৯৭৪, দ্য ওয়াইল্ড লাইফ পলিউশন প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ১৯৭২, দ্য সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৩, দ্য এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট ১৯৮৬, অথচ আইনের চোখে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রতিনিয়ত জলাশয়গুলি ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

সাইকেল র‍্যালি কাঁচরাপাড়া গান্ধিমোড় থেকে থানামোড় হয়ে মথুরা বিল, কুলিয়া বিল, গোকুলপুর, কল্যাণী, গয়েশপুর হয়ে মদনপুরের বয়সাবিল -সহ বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে। গান্ধিমোড়ের পথসভায় বিজ্ঞানকর্মী জয়দেব দে বলেন যে, কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা তথা উৎপাদন শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। জমিতে জৈব সার ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ানো দরকার। প্রকৃতির কিডনি হল জলাশয়— আমাদের দেশে জলাশয় ভরাট রোধে ১২টি আইন রয়েছে। অথচ প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি জলাশয় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। জলাশয় পরিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর জলাশয় রক্ষার জন্য কোনো ভূমিকা পালন করছে না। গোকুলপুর, কল্যাণী, গয়েশপুর, মদনপুরের পথসভায় সম্রাট সরকার, সুজয় বিশ্বাস, অনুপ হালদার, মৃগাঙ্কশেখর সুর বক্তব্য রাখেন। বক্তাদের মতে নগরায়ণ বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে গাছ কেটে সাফ করে ফেলা হচ্ছে। সুপ্রিমকোর্ট জানিয়েছে ১টি গাছ কাটলে অন্তত ৬টি গাছ লাগাতে হবে। রাস্তা চওড়া হচ্ছে, ফলে লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা যাচ্ছে। পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়ছে। জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার জন্য আম, জাম, শাল, সেগুন, জামরুল, কাঁঠাল, নিম, বট, তুলা, মেহগিনিসহ ফলের গাছ বেশি করে লাগানো দরকার। সংরক্ষিত বনে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ফলের গাছসহ বড়ো গাছ লাগাতে হবে। র‍্যালির জমায়েত অনুষ্ঠান মদনপুরের সাহেব বাগানে বিজ্ঞানকর্মীরা এক আলোচনাসভার আয়োজন করেন। সহসভাপতি তাপস মজুমদার বলেন জলাশয়গুলি যেভাবে ভরাট হয়ে যাচ্ছে, ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা ও অন্যান্য বিপর্যয় বাড়ছে। বক্তা জোর দিয়ে বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা আরও বাড়াতে হবে।

বক্তারা জানান—রাস্তার ধারে, স্কুলের চারিদিকে ফলের গাছ লাগানো দরকার। জলাভূমির সঠিক সংরক্ষণ করতে হবে। পাড়ে গাছ রাখতে হবে। পেট্রোল বা ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। সৌর বাতির ব্যবহার বাড়াতে হবে। জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত পৌরসভা স্তরে কমিটি করে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি জলাশয়কে নবজন্ম দিতে হবে। ভরাট জলাশয়গুলি আবার নতুন করে খনন করতে হবে।

জল ধরো জল ভরো। জলাশয়ের পাখি বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য গাছ লাগানো দরকার।

জলাশয় প্রকৃতির কিডনি, একে রক্ষা করুন। জলাশয় ভরাট একটি জামিন অযোগ্য অপরাধ।

জলাশয় ভরাট করতে দেবেন না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

চায় পে চর্চা

স্বাস্থ্যের বৃত্তে, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আপ্যায়নেই না, শরীর সুস্থ রাখতেও চা খান' নিবন্ধের কিছু অসম্পূর্ণতা ও গলদ নিয়ে আলোচনা করছেন **ডা. আশীষ কুমার কুণ্ডু**।

সকালবেলা এক কাপ ধুমায়িত চা না হলে চলে না। তারপর সারাদিনে আরও অনেক বার। রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে, ফাইলে নোট দিতে দিতে, ঘণ্টাখানেক আড্ডার পর ''আরেক কাপ হোক না।'' সৈয়দ মুজতবা আলী বা সন্তোষকুমার ঘোষের পাতায় পাতায় চায়ের জন্য হাঁকডাক। তার ওপর বলা হয়েছে, 'আপ্যায়নেই না, শরীর সুস্থ রাখতেও চা খান' (*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৫)।

ওই লেখাতেই আছে 'চা আসলে মানবজীবনের এক ঐতিহ্য . . .। হাজার হাজার বছর ধরে প্রাচ্যের দেশগুলিতে চা নামক পানীয়টিকে নিয়ে মাতামাতির শেষ নেই।'

স্বাস্থ্যের বৃত্তে প্রকাশিত লেখার চা-এর গুণাগুণ নিয়ে যা বলা হয়েছে, তাতে কিছুটা আতিশয্য চোখে পরে।

'রোগ প্রতিরোধ ও নানা শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায়-চা-এর যে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, একথা না মেনে উপায় নেই। গবেষণায় দেখা গেছে কয়েক ধরনের চা ক্যানসার, হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস কমানোর ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা নেয়। ওজন কমানো, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানো ও মানসিক সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে চা-এর কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। এ ছাড়া চা-এর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুণাগুণও আছে।'

ভারতবর্ষে চা-এর ইতিহাস হাজার নয়—মেরেকেটে দেড়শো বছরের।

প্রামাণ্য তথ্য অনুযায়ী চায়ের প্রথম উল্লেখ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীন দেশের হান সাম্রাজ্যে। তখন চা পান করা হত মূলত তার ভেষজ গুণের কথা ভেবে। চা সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে বার্মা এবং মধ্য এশিয়ায়। মধ্য এশিয়ায় এই প্রতিবেদকের কয়েকটি এমন 'চায়খানায়' চা খাওয়ার সুযোগ হয়েছে, যেগুলো প্রায় হাজার বছরের পুরোনো। সিল্ক রুট দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে অনেক জিনিস আদান-প্রদান হলেও চা কেন এসে পৌঁছায়নি তা অজানা। বাবর মধ্য এশিয়া থেকে অনেক মোগলাই খানা সঙ্গে আনলেও চা কেন আনলেন না, তা এক রহস্য। বাবরনামায় কোথাও চা-এর উল্লেখ নেই।

পাশ্চাত্য দেশে চায়ের প্রবেশ সম্ভবত ১৫৪৬-এ। পোর্তুগিজদের হাত ধরে চীন থেকে চা চলে যায় ভেনিসে। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে—জার্মানি, ফ্রান্স, হল্যান্ড, নিউইয়র্ক এবং ইংল্যান্ডে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে ব্রিটেনে সাধারণভাবে চায়ের প্রচলন ছিল না। তবে ব্রিটেনে যত তাড়াতাড়ি চা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা সম্ভবত আর কোথাও হয়নি।

ভারতবর্ষে চা-এর উল্লেখ অবশ্য দু-হাজার বছর আগেও আছে। কথিত আছে বুদ্ধ ভিক্ষুরা চা খেতেন (আক্ষরিক অর্থেই—চা-এর পাতা চিবোতেন)। কিন্তু ভারতে চা পানের প্রচলন ১৮৪১-এর পর ব্রিটিশদের হাত ধরে। তারা চীন দেশের চায়ে আধিপত্য কমাতে ভারতে চা চাষের প্রচেষ্টা শুরু করেন।

বস্তুত বাঙালিদের চা খাওয়ার ইতিহাস ১০০ বছরও অতিক্রম করেনি। ১৯৫০-এর আগে গ্রাম বাংলায় চা অত্যন্ত দুর্লভ জিনিস ছিল।

* * *

ওই লেখায় চা-এর 'অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টি' নিয়েও বেশ কিছু কথা বলা হয়েছে।

চা নিয়ে এই ধরনের ধারণা বহুল প্রচলিত। আমি কিছু প্রমাণিত তথ্য পেশ করার চেষ্টা করছি।

১. ২০১১-তে FDA (USA) জানায় যে চা-এর ক্যানসার কমানোর প্রবণতা সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই।

২. সম্প্রতি ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট (USA) জানায় যে তাদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে চা-এর ক্যানসার প্রতিরোধের ক্ষমতা কোনোভাবেই প্রমাণিত হয়নি।

৩. ২০১৩-এর কক্রেন (Cochrane) রিভিউ (Randomised controlled trial-এর) জানায় দীর্ঘদিন কালো চা (black tea) খেলে ব্লাড প্রেসার কিছুটা কমে।

৪. ওই কক্রেন রিভিউ আরও জানায় যে দীর্ঘদিন কালো চা খেলে LDL কিছুটা কমে।

৫. চা-এ oxalate এর পরিমাণ বেশি। বেশি চা খেলে কিডনিতে পাথর হবার সম্ভাবনা থাকে।

৬. চা খেলে ওজন কমে না।

৭. চা-এ ফ্লোরাইড-এর পরিমাণ বেশি। বেশি চা খেলে ফ্লুরোসিস হবার সম্ভাবনা থাকে।

৮. যদিও ইঁদুরের ক্ষেত্রে প্রমাণিত যে চায়ে ডায়াবেটিস (টাইপ-২) কমে, মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রমাণিত নয়।

৯. চা-এ polyphenol থাকে। এর কিছু অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুণ আছে—যা অন্ত্রের ব্যাকটিরিয়ার (intestinal pathogen) ওপর কাজ করে।

১০. চা-এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টি আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে শাকসবজি, ফলমূলে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়। তা ছাড়া অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের গুণাগুণ সম্পর্কে অন্য অনেক বিতর্ক হচ্ছে। কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের ক্ষতিও করে।

১১. চা থেকে আমাদের শরীরে অনেকটা অ্যালুমিনিয়াম আসে। অ্যালুমিনিয়াম এর সঙ্গে Alzheimer's disease-এর একটা সংযোগ আছে বলে আশঙ্কা করা হয়।

অন্যান্য নেশার মতো চা-ও একটা নেশা। নিরীহ নেশা এই যা।

* * *

আজকের দিনে চা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ অবশ্যই আসা উচিত।

১. চা শ্রমিকেরা। এদের অবস্থান সম্পর্কে সকলেই খানিকটা অবহিত। আজকের লেখায় এই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না।

২. চা-এ কীটনাশকের ব্যবহার।

চা-এ কীটনাশকের ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। মাঝে মধ্যে আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলো ভারতীয় (এবং চৈনিক) চা নিষিদ্ধ করে দেয়—চা-এ অতিরিক্ত কীটনাশকের জন্য।

অন্যান্য আনাজপাতি আমরা ধুয়ে (কখনো খোসা ছাড়িয়ে) খাই। চা-এ সেটা সম্ভব নয়। তাই surface pesticiae চা-এ থেকেই যায়। চা আমরা গরম জলে ভিজিয়ে অথবা ফুটিয়ে খাই। অর্থাৎ যতটুকু কীটনাশক চা-এ থাকে তার নির্যাস আমরা ছেঁকে নিই এবং নির্ভেজাল খেয়ে নিই। প্রসঙ্গত ভিজিয়ে খাওয়ার চেয়ে ফুটিয়ে খেলে বেশি কীটনাশক খাওয়া হয়। অর্থাৎ সকালে উঠে এক কাপ ধূমায়িত নির্ভেজাল কীটনাশক না খেলে আমাদের ঘুম ভাঙতে চায় না।

প্রশ্ন ওঠে চা-এ কি সত্যিই কীটনাশক আছে? প্যাকেট চা-এ? খোলা চা-এ? প্রথমে প্যাকেট চা-এর কথায় আসা যাক। জুন ২০১৩ থেকে মে ২০১৪-র মধ্যে গ্রিনপিস (Greenpeace) উনপঞ্চাশ রকম ব্র্যান্ডেড এবং প্যাকেট চা পাতা কেনে মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা এবং দিল্লি থেকে; তার উপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালায়। অ্যানালিসিসে যা বেরোয় তা হল—

১. ৯৪ শতাংশ চা পাতায় ৩৪ ধরনের বিপদজনক কীটনাশকের অন্তত একটি অতিরিক্ত মাত্রায় পাওয়া যায়।

২. ৫৯ শতাংশ চা পাতায় অন্তত ১০ রকম কীটনাশক অতিরিক্ত মাত্রায় পাওয়া যায়।

৩. এই ৩৪টি কীটনাশকের মধ্যে ৬৮ শতাংশ ভারতে ব্যবহার করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি আছে।

৪. এই প্যাকেট করা চা-এর মধ্যে আছে হিন্দুস্থান ইউনিলিভার লিমিটেড, টাটা গ্লোবাল বিভারেজ্যেস, ওয়া বক্রি (Wagh Bakri) টি, গুডরিক টি, টুইনিংস (Twinnings) ইত্যাদি।

এই বিশ্লেষণে যে যে কীটনাশক পাওয়া যায় তা হল—

১. মোনোক্রোটোফস (Monocrotrophos)—WHO-র মতে অত্যন্ত ক্ষতিকারক (Class 1 B)

২. ট্রায়াজোফস (Triazophos)—অত্যন্ত ক্ষতিকারক (Class 1B)

৩. টেবুফেনপিরাড (Tebufenpyrad)—লিভারের পক্ষে ক্ষতিকারক, ভারতে নিষিদ্ধ।

৪. ডিডিটি (DDT)—১৯৮৯ থেকে ভারতে কৃষিতে নিষিদ্ধ।

তালিকাটি দীর্ঘ। আর কীটনাশকের শারীরিক ক্ষতির আলোচনায় আমি যাচ্ছি না।

খোলা চা পাতার ওপর সঠিক তথ্য জোগার করতে পারিনি। আশঙ্কা হয় চা পাতার আয়ু (shelf life) বাড়ানোর জন্য ব্লেন্ডাররা আবার কিছু কীটনাশক ব্যবহার করতে পারেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখি সমস্যাটা শুধু আমাদের বা চীন দেশের নয়। ২০১৩–২০১৪ সালে আমেরিকার সবচেয়ে নামি চা কোম্পানি সেলেজিয়াল সিজনিং (Celetial Seasoning) টিভানা (Teavana)-র ইত্যাদির খোলা চা পাতায় প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিকারক কীটনাশক পাওয়া যায়।

চলে যাচ্ছে। নীলকণ্ঠর জাত আমরা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. আশীষকুমার কুণ্ডু, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, এমডি। ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহেবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

Advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ : ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছব পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। ‘‘সন্দীপ্তাকে মনে রেখে’’ মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে ‘‘মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন’’।

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য

কৃষ্ণা ট্রাস্ট এবং ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ-এর আহ্বানে 'তৃতীয় কৃষ্ণা স্মৃতি বক্তৃতা' দিয়েছিলেন শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রচার কমিটির পক্ষ থেকে **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**। সেই ভাষণের মূল কথাগুলো এখানে রাখা হল।

নারী-স্বাস্থ্য মানে কেবল স্ত্রীরোগ?

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নারী বলতেই যোনি-জরায়ু-স্তন সবর্স্ব এক ব্যক্তির রূপ আমাদের সামনে হাজির করা হয়। ভুলে যাওয়া হয় তার বাইরেও তার একটা সচল হৃৎপিণ্ড আছে—আছে ক্ষুধাভরা জঠর—সবার ওপরে আছে এক সৃজনশীল মস্তিষ্ক। কিন্তু দেখা যাক নারীরা মানবসমাজের জন্য কী করেন, আর কতটুকু পান।

চিত্র ১. এই নারীদের স্বাস্থ্য নিয়ে কে ভাবে?

রাষ্ট্রসংঘের হিসেব বলে:

- বিশ্বের মোট কাজের ঘণ্টার শতকরা ৬৭ ভাগ করেন মেয়েরা;
- কিন্তু বিশ্বের মোট ব্যক্তিগত আয়ের শতকরা ১০ ভাগ মাত্র মেয়েদের;
- বিশ্বের মোট সম্পত্তির শতকরা ১ ভাগেরও কম মেয়েদের অধিকারে;
- বিশ্বে প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিতদের মধ্যে প্রতি তিনজনের দু-জনই মেয়ে।

নারীর স্বার্থ বাদ দিয়ে নারীর স্বাস্থ্য হতে পারে কি? আর এই লিঙ্গ-বৈষম্য বজায় রেখে নারীর স্বার্থ কথাটা উচ্চারণ করে কতটুকু লাভ? কিন্তু সরকার থেকে এনজিও, বিরোধীপক্ষ থেকে সংবাদপত্র—প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাবিদরা আমাদের বোঝান, নারীর স্বাস্থ্য যেন সমাজ-বিচ্ছিন্ন একটা আলাদা ব্যাপার, এভাবে দেখলে হয়তো নারীর স্বাস্থ্যোন্নতি হতে পারে। তার পরেও বলা হয়, নারীর স্বাস্থ্য মানে নারীর জনন-স্বাস্থ্য। আর তাই স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে দেখি, নারীর স্বাস্থ্য নিয়ে প্রকল্প নেওয়া মানেই নারীর জনন-স্বাস্থ্য নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে:

- ১৯৮০ মা ও শিশু স্বাস্থ্য (MCH–Maternal & Child Health)
- ১৯৯২ শিশু সুরক্ষা ও নিরাপদ মাতৃত্ব (CSSM–Child Security & Safe Motherhood)
- ১৯৯৭ প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য (RCH-I–Reproductive & Child Health)
- ২০০২ প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য (RCH-II)

এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারে, এমনকী নারীর জনন-স্বাস্থ্যের উন্নতিও নারী-কেন্দ্রিক নয়, তা হল সমাজের ক্ষমতাধরদের ও পরিবারের অন্যদের স্বার্থে নারীর প্রজনন ক্ষমতা সুষ্ঠু ব্যবহারের উন্নতি।

নারী-স্বাস্থ্য মানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ!

দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে সমার্থক করে দেখানো হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মানে পরিবার পরিকল্পনা, পরে নাম দেওয়া হয়েছে পরিবার কল্যাণ। পরিবার পরিকল্পনা বা কল্যাণের কার্যকর অর্থ দাঁড়িয়েছে জন্ম নিয়ন্ত্রণ। তাতেও গুরুত্ব পেয়েছে মেয়েদের ব্যবহারের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি, বিশেষত মেয়েদের বন্ধ্যাকরণ অপারেশন। অথচ বিগত শতকের সাতের দশকের শুরু থেকে আটের দশকের মাঝামাঝি অবধি এ দেশে ১ লাখ ৮০ হাজার মহিলার মৃত্যু হয় বন্ধ্যাকরণ শিবিরগুলিতে।

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার কেন্দ্রে থেকেছে পরিবার পরিকল্পনা। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)-র ব্যয়বরাদ্দ যদি দেখি, দেখব পরিবার কল্যাণ দফতরের বাজেট যেখানে ১৫,১০০ কোটি টাকা, সেখানে স্বাস্থ্য দফতরের বাজেট মাত্র ৫,১০০ কোটি টাকা।

২০০০ সালে নতুন সহস্রাব্দ শুরুর আগে বিভিন্ন বিষয়ে নানান লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছিল। এদের বলা হত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল'। ৫ নম্বর মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ছিল ১৯৯০ থেকে ২০১৫-র মধ্যে মায়েদের মৃত্যুর হার (maternal mortality rate) শতকরা ৭৫ ভাগ কমিয়ে ফেলা। কিন্তু 'পরিবার কল্যাণ'-কে এত অগ্রাধিকার দিয়েও তা হয়নি। সারা পৃথিবীর মায়েদের মৃত্যুর হার ১৯৯০ থেকে শতকরা মাত্র ৪৭ ভাগ কমেছে। প্রতিদিন প্রায় ৮০০ মহিলা গর্ভাবস্থা ও প্রসবসংক্রান্ত নিবারণযোগ্য কারণে মারা যান। এই মৃত্যুগুলোর শতকরা ৯৯ ভাগ ঘটে অনুন্নত দেশগুলোতে, যাদের পোশাকি নাম 'উন্নয়নশীল দেশ'। উন্নয়নশীল দেশগুলোর শতকরা মাত্র ৫৮ ভাগ নারীর প্রসব দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা হয়। অন্য দেশের সঙ্গে তার তুলনা করলে দেখা যায় ভারতে মাত্র শতকরা ৪৭ ভাগ প্রসব দক্ষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে হয়, সেখানে চীন, শ্রীলঙ্কা, ব্রাজিল ও থাইল্যান্ডে যথাক্রমে শতকরা ৯৬, ৯৭, ৯৮ ও ৯৯ ভাগ প্রসব দক্ষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে হয়। আশ্চর্য হল, ভারত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ, রাষ্ট্রসংঘে

সিকিউরিটি কাউন্সিলে সদস্যপদেরর দাবিদার, যে দেশের জিডিপি-র তুমুল বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দেয় সহস্র-কোটিপতিদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, সে দেশ স্বাস্থ্যের বিচারে 'উন্নয়নশীল দেশ'-গুলোরও তলার ধাপে।

মায়েদের মৃত্যু ও মাতৃত্বঘটিত রোগভোগ

'মায়েদের মৃত্যু' বা 'মাতৃমৃত্যু' বা ইংরাজিতে maternal mortality-এর মানে হল গর্ভাবস্থায় বা গর্ভাবস্থা শেষ হওয়ার ৪২ দিনের মধ্যে মহিলার মৃত্যু।

রাষ্ট্রসংঘের পূর্বতন মানবাধিকার হাইকমিশনার মেরী রবিনসন মায়েদের মৃত্যুকে এক মানবাধিকার সংকট আখ্যা দিয়েছিলেন—"যে সংখ্যায় মাতৃমৃত্যু ঘটছে তা মানবিকতার লজ্জা . . . এই ব্যাপারটাকে ঠিক অত্যাচার, উধাও করে দেওয়া, ইচ্ছামাফিক বন্দি করে রাখা, বিশ্বাসজনিত কারণে বন্দি রাখা—এগুলোর মতোই মানবাধিকার লঙ্ঘনের শ্রেণিভুক্ত করার সময় এসেছে।"

২০১৩-এ দেখা যায় সারা পৃথিবীতে ২৮৯,০০০ মহিলা মাতৃত্বঘটিত কারণে মারা যান। এর মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ আফ্রিকা ও এশিয়ায়। মোটামুটি ৫০,০০০ ভারতে। কিন্তু কেবল মৃত্যুর সংখ্যা দিয়ে মায়েদের দুর্ভোগ বোঝা যাবে না। যদি একজন মায়ের মৃত্যু হয়, তো আরও ৩০ জন মা মাতৃত্বঘটিত কারণে আঘাত, জীবাণুসংক্রমণ এবং পঙ্গুত্বে ভোগেন, কিন্তু প্রাণে মরেন না।

মায়েদের মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো এরকম

◆ রক্তক্ষরণ	৩৪%
◆ উচ্চরক্তচাপ	১৮%
◆ জীবাণুসংক্রমণ	৮%
◆ গর্ভপাত	১০%
◆ এম্বলিজম	১%
◆ অন্যান্য প্রত্যক্ষ কারণ	১১%
◆ অপ্রত্যক্ষ কারণ	১৮%

স্বাধীনতার পর মায়েদের স্বাস্থ্যের জন্য এতসব গালভরা নামের প্রকল্প হলেও ভারতের মায়েদের মৃত্যু-হার প্রতি ১০০০০০ জীবিত সদ্যোজাত পিছু ২১২। অথচ জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল ২০১৫-র মধ্যে মায়ের এই মৃত্যুর হার ১০০-তে নামিয়ে আনা।

'তিনটে বিলম্ব'-এর কারণে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হার বাড়ে—চিকিৎসা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব, যথাযথ চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছোতে বিলম্ব এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছে যথাযথ চিকিৎসা পেতে বিলম্ব।

কিন্তু এগুলো তো সরাসরি কারণ, যে কারণগুলো ডাক্তাররা চোখে দেখতে পান। যে কারণগুলো ডাক্তাররা দেখতে পান না বলে সরকারি জাবদা খাতায় ওঠে না, সেই কারণগুলোকে নিয়ে ভাবার চেষ্টা সরকার করেন না। শুধু করেন না বললে ভুল হবে, অনেক সময়েই সেই কারণগুলো চলতি ব্যবস্থাকে নগ্ন করে ফেলে বলে সেগুলোকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা চলে। মায়েদের মৃত্যুর পেছনে সেই 'আর্থ-সামাজিক কারণ'-গুলোর কয়েকটা হল দারিদ্র, অশিক্ষা, বাল্য-বিবাহ, জাত-পাত এবং চিকিৎসা-পরিষেবার অভাব।

মূল 'আর্থ-সামাজিক কারণ'-গুলোর কথা বলতে গেলে যে আলোচনায় ঢুকতে হবে তা এই নিবন্ধের পরিসরের বাইরে, তাই স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যে যেটুকু কারণ খুঁজে বের করা হয়েছে সেটুকুতেই আলোচনা এখানে সীমায়িত রাখব। তবে আবার স্মরণ করিয়ে দেব, এই নিবন্ধের পরিসরের বাইরে হলেও, সেগুলোই মূল বা আদি কারণ, এবং সেগুলো নিয়ে জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ বাদ দিয়ে নারীস্বাস্থ্যের উন্নতি-প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ।

গর্ভাবস্থা এবং পরিবার পরিকল্পনার কথা যদি বলেন তার কারণেই মহিলাদের স্বাস্থ্যপরিষেবার প্রয়োজন পুরুষদের চেয়ে বেশি। একজন মহিলা যদি দু-টি সন্তান চান তা হলে মোটামুটি ৫ বছর কাটে গর্ভবতী হওয়ার প্রচেষ্টায়, গর্ভাবস্থায় বা প্রসব-পরবর্তী অবস্থা থেকে সেরে উঠতে। আর ৩০ বছর কাটে অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রচেষ্টায়।

কেবল প্রজনন-স্বাস্থ্য?

কেবল কি প্রজনন-স্বাস্থ্য? ভারতের প্রায় অর্ধেক ডায়াবেটিস রোগী মহিলা। আর অনুমান করা হয় ২০১০ থেকে ২০৫০-এর মধ্যে অধিকাংশ ডায়াবেটিস রোগীই হবেন মহিলা। মেয়েদের অপুষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি—সবচেয়ে শেষে, সবচেয়ে কম খাবার জোটে তাঁদের। হার্ট অ্যাটাকে তাঁরা মারা যান ছেলেদের চেয়ে বেশি। তাঁরা অবসাদ ও উদ্বেগে ভোগেন ছেলেদের চেয়ে বেশি। যৌন রোগের প্রভাব মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি মারাত্মক। গেঁটে বাতের প্রকোপ মেয়েদের মধ্যে বেশি। মূত্রনালীর জীবাণুসংক্রমণ তাঁদের বেশি হয়।

শুধু তাই নয় ক্রমাগত কম পারিশ্রমিক-অতিরিক্ত কাজের চাপ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্যপরিষেবার ন্যূনতম সুযোগের অভাব ও জীবনধারণের অন্যান্য উপাদানগুলির অভাব মেয়েদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়েরাই শিশুদের চিকিৎসার প্রয়োজন মেটানোর মূল দায়িত্ব নেন। অথচ পরিবারে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ মহিলার হাতে থাকে না। অধিকাংশ মহিলা স্বাস্থ্যবিমার সুযোগ পান স্বামীর সূত্রে। স্বামীর কর্মচ্যুতিতে তাঁরা বিমার সুবিধা হারান। সুবিধা হারান বিবাহ-বিচ্ছেদেও।

কেবল বেশি রোজগার হলেই সব সুবিধা হবে, এমন নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধনী দেশ, বিশ্বের এক নম্বর শক্তিশালী দেশও। কেমন আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহিলারা? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রজননক্ষম মহিলাদের মৃত্যুর হার কানাডা, পোল্যান্ড, গ্রিস, আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড ও বেলোরুশের চেয়ে বেশি। ২০১৩-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মায়েদের মৃত্যুর হার ছিল কানাডার দ্বিগুণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র উন্নত দেশ যেখানে সবার জন্য স্বাস্থ্য নেই, সরকার সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেয় না।

স্বাস্থ্য-পরিষেবা প্রদানে নারীর ভূমিকা

স্বাস্থ্য-পরিষেবা দেওয়ার কাজে মহিলাদের ভূমিকা পুরুষদের চেয়ে বেশি। না, সম্প্রতি খবরের কাগজে যে পরিসংখ্যান বেরিয়েছে—মেয়েরা এখন ছেলেদের চাইতে বেশি সংখ্যায় ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হচ্ছে, আমি সে কথাটা বলছি না। স্বাস্থ্য-পরিষেবার মধ্যে একটা বিরাট ও 'অমূল্য' অংশ হল পারিবারিক শ্রম। চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের বাইরে, মেয়েরা পুরুষদের চাইতে

বেশি করে বিনামূল্যে পরিবারে রোগীর যত্ন নেন—হিসেবে দেখা যায় এ কাজে মেয়েদের অবদান শতকরা ৫৯ ভাগ। পরিবারের অসুস্থ, পঙ্গু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের যত্ন পুরুষের তুলনায় মহিলারা বেশি নেন। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা আংশিক সময়ের জন্য কম অর্থকরী কাজ করতে বাধ্য হন। নারীরা এই পারিবারিক কাজের সামাজিক অথবা আর্থিক স্বীকৃতি পান না, উপরন্তু তাঁদের বেশি করে অর্থকরী শ্রম থেকে ছুটি নিতে হয়। ছুটির সময় মাইনে জোটে খুব কম ক্ষেত্রে, আর অনেক ক্ষেত্রে ছুটি নেবার জন্য কর্মচ্যুতি হয়। এমনকী উচ্চশিক্ষিতদের জন্য উঁচু বেতনের কাজেও সন্তানধারণ ও বাচ্চা, বৃদ্ধ, পঙ্গু, রুগ্ন—এদের দেখভাল করার জন্য মেয়েরা চাকরির জায়গায় পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হন।

সবার জন্য স্বাস্থ্যই একমাত্র উপায়

সবার জন্য স্বাস্থ্যই একমাত্র উপায় যা দিয়ে মহিলাদের স্বাস্থ্য সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। সবার জন্য স্বাস্থ্য চালু থাকলেই কেবল গরিব পরিবারগুলি অত্যাবশ্যক প্রাথমিক পরিষেবাগুলি পেতে পারেন, যা তাঁদের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থাতেই কেবল প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন (service integration) করা যায়। সুস্থ গর্ভাবস্থা, প্রসব এবং শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী ভিজিটগুলি এই ব্যবস্থায় পাওয়া যায়।

সবার জন্য স্বাস্থ্যের কর্মসূচি পাঁচরকমভাবে কাজ করে—-এতে অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলির এক প্যাকেজ পাওয়া যায়। সহজে নির্ভরযোগ্য পরিষেবা পাওয়া যায়। পরিষেবা পাওয়ায় কোনো আর্থিক বাধা থাকে না। সামাজিক বাধাগুলি কমে আসে। পরিষেবার মানের ওপর নজর রাখা হয়।

মেক্সিকোর Seguro Popular (জনপ্রিয় স্বাস্থ্য বিমা)-এর অভিজ্ঞতা দেখুন। ১৯৯০-এর দশকে সে দেশে শতকরা ৫০ জনেরও বেশি মানুষকে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত খরচ নিজের পকেট থেকে করতে হত। আর এখন ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ারের প্যাকেজে স্তন-ক্যানসার, সারভাইক্যাল ক্যানসার, এইচ আইভি/এডসসহ ২৫০টি পরিষেবা প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত। স্বাস্থ্য বাজেটে বছরে জিডিপি-র মাত্র শতকরা ১ ভাগ বাড়িয়েই সে দেশে এমনটা করা গেছে।

আফগানিস্তানে ২০০৩-এ অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলির এক প্যাকেজ চালু করা হয়। তার আগে ১০ জনের মধ্যে ৯ জন মহিলারই দক্ষ ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া প্রসব হত। কয়েকশো দাই এবং কয়েক হাজার কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আগে যেখানে জনসংখ্যার শতকরা ১০ জন প্রাথমিক পরিষেবা পেতেন, তা বেড়ে হয় শতকরা ৬০ জন। ১ লক্ষেরও বেশি কমে শিশু মৃত্যু। পরিবার-পরিকল্পনার আওতায় প্রায় দ্বিগুণ পরিবার আসেন। মায়েদের মৃত্যুর হার কমে যায়।

সবার জন্য স্বাস্থ্য—এ দেশে

২০১০ সালে যোজনা কমিশন সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে এক উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞদল (HLEG on UHC–High Level Expert Group on Universal Health Coverage) গঠন করে। ২০১১-এ বিশেষজ্ঞদল তার সুপারিশগুলি পেশ করেন। তাঁরা এক হেলথ এনটাইটেলমেন্ট কার্ডের কথা বলেন যা দিয়ে প্রত্যেক নাগরিক অত্যাবশ্যক প্রাথমিক স্তরের, মধ্যস্তরের ও উচ্চতম স্তরের আউটডোর ও ইনডোর পরিষেবার এক জাতীয় প্যাকেজের সুবিধা পাবেন। তাঁরা বলেন এই পরিষেবার টাকা আসবে সরকারের সংগৃহীত ট্যাক্স থেকে। পরিষেবা যেখানে দেওয়া হবে সেখানে পয়সা লাগবে না, অর্থাৎ 'ইউজার ফি' তুলে দেওয়া হবে। তাঁদের মত ছিল যে 'কিছু টাকা স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণকারী দেবেন, আর কিছু টাকা দেবেন সরকার বা বিমা সংস্থা', এমন 'Contributory Social Insurance' ভারতের মতো দেশের জন্য উপযুক্ত নয়, কেননা সেখানে প্রায় শতকরা ৯৩ জন শ্রমজীবী মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন, ও এক বিশাল সংখ্যক মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন।

বিশেষজ্ঞ দল বলেন

- প্রথমত স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় বাড়াতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে দেশের জিডিপি-র শতকরা ২.৫ ভাগ খরচ করবে, ত্রয়োদশ পঞ্চবার্ষিকীর শেষে খরচ করবে জিডিপি-র শতকরা ৩ ভাগ।
- দ্বিতীয়ত চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের সংখ্যা ও গুণমান বাড়াতে হবে।
- তৃতীয়ত সব সরকারি কেন্দ্রে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ ও পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি মজবুত রেফারেল ব্যবস্থা ও রোগী পরিবহণের সুব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের, মধ্যস্তরের ও উচ্চতম স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সমন্বিত করতে হবে।

সবার জন্য স্বাস্থ্য—সরকারের ইচ্ছে নেই

কিন্তু ২০১২-এ যোজনা কমিশন তার প্ল্যান ডকুমেন্টে কী বলছিল দেখুন—

- স্বাস্থ্যখাতে বাজেটের শতকরা ২.৫ ভাগ নয়, ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হবে শতকরা ১.৫৮ ভাগ।
- কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হবে স্বাস্থ্যখাতে রাজ্যের ব্যয়ের চেয়ে কিছু বেশি।
- সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় কেন্দ্রীয় ভূমিকার পরিবর্তে মূলত 'ম্যানেজারের ভূমিকা' পালন করবে।
- বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্বাস্থ্য-বিমার ভূমিকা হবে প্রধান।
- লাভজনক তৃতীয় স্তরের পরিষেবাকে তুলে দেওয়া হবে কর্পোরেট হাসপাতালের হাতে।
- যেটুকু সরকারি ব্যবস্থা আছে, তাও গুটিয়ে ফেলা হবে।
- সরকারি অনুদান ও ভর্তুকিতে পুষ্ট হয়ে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা ও অসরকারি সংস্থাগুলো নতুন চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তুলবে।
- প্রতি পরিবার নিজের পছন্দমতো বেসরকারি হাসপাতাল বেছে নেবেন, সরকার একটা সীমা অবধি তার মূল্য চুকিয়ে দেবে।
- জাতীয় স্বাস্থ্য প্যাকেজের উল্লেখ ছিল না এই দলিলে।
- চিকিৎসকের অভাব মেটানোর জন্য প্রাইভেট হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার জন্য সরকার উৎসাহ দিতে মোট খরচের শতকরা ২০ ভাগ অবধি অনুদান দেবে—এমনটা বলা হল। তাদের আয় বাড়ানোর জন্য কর ছাড় দেওয়া হবে। বাস্তবত অনেকটাই

সরকারি অর্থে গড়ে তোলা বেসরকারি হাসপাতালে ইউজার ফি সবই নেওয়া যাবে।

তারপর মোদি সরকার ক্ষমতায় এসে স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় প্রায় শতকরা ২০ ভাগ কমিয়ে দিয়েছে। শতকরা ২০ ভাগ মানে ৫০০০ কোটি টাকা। এখন জিডিপি-র শতকরা ১.০৪ ভাগ সরকার স্বাস্থ্য খাতে খরচ করে।

যোজনা কমিশনের স্থান নিয়েছে নীতি আয়োগ—NITI (National Institution for Transforming India) Aayog। ২০১৫-র খসড়া স্বাস্থ্যনীতিতে জনস্বাস্থ্যে জোর দেওয়া, সরকারি খরচ বাড়ানো, বিনামূল্যে ওষুধ ও পরীক্ষানিরীক্ষার যে কথা বলা হয়েছে—তার বিরোধিতা করেছে 'নীতি আয়োগ'। তাদের মতে সরকারের পক্ষে জিডিপি-র শতকরা ১ ভাগের বেশি স্বাস্থ্যখাতে খরচ করা সম্ভব নয়। তাদের সুপারিশ জনস্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় বেসরকারি ক্ষেত্র ও বিমা কোম্পানিগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হোক, নাগরিক পয়সা দিয়ে স্বাস্থ্য-পরিষেবা কিনবেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬-এ সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার রাজ্যের প্রতিনিধি এবং জনস্বাস্থ্যবিদদের নিয়ে এক মিটিং-এ বসেছেন খসড়া স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে আলোচনা করতে। সেখানে স্বাস্থ্যখাতে সরকারের জিডিপি-র শতকরা ২.৫ ভাগ খরচ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সরকারের এতাবৎ যা কাজের ধারা তাতে না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

মানুষের কথা কে বলবে?

১৯৩৬-এ ডা. নর্মান বেথুন বলেছিলেন—

"স্বাস্থ্য সুরক্ষার সবচেয়ে ভালো উপায় হল যে আর্থিক ব্যবস্থা কুস্বাস্থ্যের জন্ম দেয় তাকে বদলে ফেলা, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতা, দারিদ্র ও বেকারি লোপ করা। প্রত্যেকে নিজের নিজের চিকিৎসা কিনবেন এই প্রথা কাজ করবে না। এমনটা অন্যায়, অদক্ষ, সম্পদ নষ্ট হয় এতে, এমনটা এ যুগের জন্য নয়। . . . প্রবল গতিসম্পন্ন বর্তমান যন্ত্রশিল্প-নির্ভর সমাজে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলে কিছু হয় না, স্বাস্থ্য মানেই সর্বতোভাবে সামূহিক স্বাস্থ্য। একজনের অসুস্থতা বা মানিয়ে নিতে না পারা সমাজের অন্য সবাইকে প্রভাবিত করে। সরকারের উচিত জনস্বাস্থ্য সুরক্ষাকে নিজের প্রাথমিক দায়িত্ব এবং নাগরিকদের প্রতি কর্তব্য হিসেবে স্বীকার করা।"

চিত্র ২. শ্রমজীবী নারীর অধিকাংশই যুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রে

আমাদেরও আশু দাবি হল, সরকার সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নিক। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, নিপীড়িত অবহেলিত মানুষ নিজের লড়াই না করে কোনোদিন কোনো অধিকার পায়নি। স্বাস্থ্য নিয়ে নারীরা নিজের দাবিগুলো তৈরি না করলে, সেই দাবির ভিত্তিতে সংগ্রাম না করলে, তারা অবহেলিতই থাকবে। সেই সংগ্রাম গড়ে উঠুক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ডা. কে শ্রীনাথ রেড্ডি, ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায় এবং সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে সংগ্রামরত অনেক সহযোদ্ধা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র সম্পাদক; শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে ওঠা দু-টি ক্লিনিকে কাজ করেন; 'সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রচার কমিটি'-র আহ্বায়ক।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

দ্বিতীয় পর্ব

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) **দিনলিপি থেকে** পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে, ২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এটি দ্বিতীয় পর্ব। পাঠক দিনলিপিতে উল্লেখিত টাকার অঙ্কের প্রকৃত মূল্য সেকালের নিরিখে আশাকরি বুঝে নেবেন। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সেকারণে দিনলিপি-র অনেক আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

এই ফাঁকে সে-সময়ের ঘোষ-জমিদারবাড়ির ছবিটা একটু দেখে নেওয়া যাক। বাড়ির চৌহদ্দি-প্রায় এক মাইল লম্বা। বাড়ির দক্ষিণদিকে ঠাকুরবাড়ির আঙিনা; ওই আঙিনার উত্তরে চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে বছর-বছর দুর্গা ও অন্যান্য প্রতিমাপুজো হয়। আঙিনার পুবে পশ্চিমে দক্ষিণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কতক ঘরদোর। আঙিনার ঠিক মাঝে বিশাল চারপাশ-খোলা একটা খোড়ো-চালাওয়ালা ম্যারাপ। ওই মঞ্চেই যাত্রাপালা-টালা হত। যখন কিছু থাকত না, তখন ওখানেই স্কুল বসত। চণ্ডীমণ্ডপের পিছনে একটা ঘরে মাস্টারমশাই আর বাইরের গ্রাম থেকে আসা ছাত্ররা থাকত। আঙিনার পুব পশ্চিমের ঘরদোরগুলো ছিল অতিথি-নিবাস। আঙিনার পিছনে মাটি আর দরমা বেড়া দিয়ে বানানো আরও কিছু ঘরদোর ছিল। ওগুলো জমিদারির সেরেস্তা। এগুলোর উত্তরে ছিল ভাঁড়ার ঘর। এটাও মাটি আর দরমা দিয়ে তৈরি। এখানে পানীয় (মদ), পোশাক-আশাক, আয়না, চিরুনি, ব্রাশ, জুতো, জামা, খড়ম—এরকম রকমারি জিনিসপত্তর আলমারিতে ঠাসা থাকত। এই ভাঁড়ার ঘরটার পুবে মন্দির; পশ্চিমে ধানের মরাই। মরাইয়ের পিছনে একটা বিশাল উঁচু ইট-গাঁথা পাঁচিল আর ভিতরবাড়িতে ঢোকবার দরজা। বাড়ির চৌহদ্দিতে চারটে দরজা। আমি শুধু পুবের দরজাটার কথাই বললাম। দক্ষিণের তিনটে দরজা আকারে ছোটো। মূল বসতবাড়িতে আটটা বাড়ি—পাঁচটা আটচালা আর তিনটে দোতালা। তার উত্তর দিকে দিঘির ঘাটের সিঁড়ি নেমে গেছে; তার পাশেই গোয়ালঘর। ভিতরবাড়ির দক্ষিণে শস্য-গোলা, পশ্চিমে পোড়ো জমি। ওখানে অনেকগুলো দেওয়াল-ঘেরা শৌচাগার; প্রত্যেকটিতে চারটে ইটের ধাপ বসানো—যাতে উবু হয়ে বসা যায়। এগুলো কেবল মেয়েরাই ব্যবহার করত। রোজ জমাদার এসে এগুলোকে সাফসুতরো রাখত। এর পিছনে গড়খাই; যার পাড়ে অন্যান্য মানুষজনের বসতি।

ডা. হৈমবতী সেন

পুকুরের পুবপাড়ে ছোটো তরফের পরিবারের ভিটে। তারাও পুকুরটা সবরকম কাজে ব্যবহার করত। মন্দিরের পুবদিকে কুঞ্জবন। মন্দিরের তিনটি আলাদা কোঠাবাড়ি। সেখানে রোজ পঞ্চাশজন বামুনের পাত পড়ত। মন্দিরের ভেতর সযত্নে রাখা থাকত বিগ্রহের যাবতীয় উপকরণ—গয়নাগাঁটি, শোভাযাত্রার ছত্র এবং আরও অনেক কিছু। গাঁয়ের প্রায় অর্ধেকটা জুড়েই ছিল মন্দিরের এলাকা—এ সবকিছু আমার নিজের চোখে দেখা। মন্দিরের প্রত্যেকটা কোঠাবাড়ি আর তার সংলগ্ন প্রাঙ্গণ বানাতে কম করে দু থেকে তিন হাজার টাকা খরচ হয়েছিল নিশ্চয়ই; আমি ভেবে পাই না, এত খরচ করেও তাঁরা কেন ইট-গাঁথা বাড়ি বানাননি! এই বাড়িগুলো বানাতে যে পরিমাণ ইট আর কাঠ লেগেছে; ইটের গাঁথনি তুলে পাকা বাড়ি বানাতে তার থেকে বেশি ইট কাঠ লাগার তো কথা নয়।

বাড়িগুলো দেখতে কেমন ছিল? একটার চেহারাটা দেখা যাক। ঘন করে সাজানো ইটের প্রায় একতলা সমান উঁচু বেদি। তার উপরে মেঝে। কাঁঠাল বা সুন্দরি কাঠে তৈরি সুন্দর কারুকাজ করা থাম কড়িকাঠগুলোকে ধরে রেখেছে। দেওয়াল কাঠের তক্তা আর আরশি দিয়ে সাজানো। প্রতিটি বাড়িতে আটটি করে ঘর বা কক্ষ। আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না এত দামি দামি উপকরণে তৈরি বাড়ির কেন খড়ে-ছাওয়া চাল! পরে অবশ্য আমি শুনেছি যে পাকাবাড়ি আমাদের পরিবারের পক্ষে শুভ নয়। ভিতরবাড়ির পাঁচিল ৩৬ ফুট উঁচু। চাতালে, একটা দরজার পেছনে একটা ছোটো ঘর। সেখানে গাইয়ে-বাজিয়েরা রোজ গানবাজনা করত। ওই ঘরেই কয়েকটা বড়ো বড়ো ঢাক ছিল। যখন কর্তারা বাড়ি ফিরতেন কিংবা কোনো লড়াইয়ে জিতে আসতেন তখন তুমুল জোরে ঢাকে কাঠি পড়ত। ব্যবস্থাটা ছিল

এইরকম—মন্দিরে আরতির সঙ্গে সঙ্গে আটটা করতাল, বেশ কয়েকটা বড়ো ঘণ্টা আর দুটো শাঁখ বাজত। একটা ঘরে ছিল নানা ঠাকুরদেবতার বিগ্রহ। ছিল সংহারক শিবের দু-টি ছোটো বিগ্রহ, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, ঐশীমাতা দুর্গা, কৃষ্ণের মদনগোপাল মূর্তি, পাশে লীলাসঙ্গিনী রাধা, স্বামী নারায়ণের (সৃষ্টি রক্ষাকর্তা) সঙ্গে ধনদেবী লক্ষ্মী। একটা নাড়ু হাতে নাড়ুগোপাল (বালগোপাল) মূর্তিও ছিল। চব্বিশটি শালগ্রাম শিলা নারায়ণরূপে পূজিত হতেন। বিদ্যার দেবী সরস্বতী, ইঁদুর বাহনসহ গণেশ—এরকম নানা দেবদেবীর মূর্তি সে ঠাকুরঘরে। আর একটি ঘরে কষ্টিপাথরে তৈরি বড়ো করালবদনা কালীমূর্তি। তিনি দেবী সিদ্ধেশ্বরী রূপে পূজিত হতেন; যিনি সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। এবং তাঁকে ঘিরে বিষ্ণুর ছোটো ছোটো দশাবতার মূর্তি। কালী আমাদের গৃহদেবী। শ্মশান কালী, রক্ষাকালীর বিগ্রহও ছিল। রক্ষাকালী ছিলেন গ্রামের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিতা। দোলের সময় শিবপূজা হত। আমাদের শিববিগ্রহটিকে উৎসব-প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হত। এইসব বিগ্রহের পুজোআচ্চা করার জন্য দেবোত্তর নির্দিষ্ট ছিল। যার বার্ষিক আয় প্রায় ১৬,০০০ টাকা। এত টাকাতেও সব খরচ কুলোত না; বড়ো বড়ো উৎসব-অনুষ্ঠান বা পুজোর আচার পালনের জন্য পরিবার থেকে টাকা ভরতুকি দিতে হত।

এই বিপুল সম্পত্তির মালিক মাত্র ষোলো বছর বয়সি এক কিশোর। দেবোত্তর বাদে সেসময়ে এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় ৩,৭৫,০০০ টাকা। দেওয়ানগুলো কূট মতলববাজ। স্বার্থ হাসিল করাই তাদের ধ্যানজ্ঞান। গোমস্তা স্বরূপচন্দ্র দাস মানুষটি মোটের উপর খারাপ নন। তিনি দেওয়ানদের নানা কুকীর্তির কথা কিশোরের অভিভাবিকার কাছে ফাঁস করে দিতেন। দেওয়ানরাই-বা ছাড়বে কেন? তারাও গোমস্তার নামে মিথ্যে লাগানি-ভাঙানি দিত—একটা ষোলো-সতেরো বছরের বাচ্চা ছেলেকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি! কে তার পরোয়া করে? এইভাবে জমিদারির একাংশ বেনামে বিক্রি হয়ে গেল। লাভের গুড় খেয়ে নিল নায়েবের দল। বাবার বয়স যখন আঠারো, মায়ের বয়স সাত, তখন ওঁদের বিয়ে হয়। কুমিয়া-গ্রামবাসী প্রয়াত লোকনাথ মিত্রের একমাত্র মেয়ে আমার মা। দাদুর চার বউ। আমার মা তাঁর দ্বিতীয় বউয়ের মেয়ে। তাঁর প্রথম এবং তৃতীয় বউ নিঃসন্তান। মা-র জন্মের সময়ে তাঁর কনিষ্ঠা সৎ-মা নেহাতই শিশু। পরে তাঁর চারটি ছেলে হয়, সে অবশ্য অনেক পরের কথা। সেসময়ে আমার শ্রদ্ধাস্পদ মা-ই মিত্রমশায়ের একমাত্র মেয়ে। তিনি বিয়েতে ৯০০ টাকা পণ দেন। বিয়ের কিছুদিন বাদে আমার পিসির একটি মেয়ে হল। পরিবারে আমাদের প্রজন্মের সে-ই প্রথম সন্তান। তাঁর জন্মোৎসব পালন করতে বাড়িতে নহবত বসল।

মায়ের কুড়ি বছর হতে-না-হতেই কাকাদের বিয়ে হয়ে যায়। এক কাকা চন্দ্রকুমার মারা যান। এই সময়ে জমিদারি-ভূসম্পত্তি নিয়ে কত যে মামলা-মোকদ্দমা চলছিল আমি তা জানব কী করে! মা আর কাকারা প্রায় সমবয়সি ছিলেন। মায়ের ছেলেপিলে হচ্ছে না দেখে কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা নেওয়া হল। পবিত্র গ্রন্থ হরিবংশ থেকে এক বছর ধরে রোজ পাঠ করা হত। ঠাকুরদের তুষ্টিবিধানে কিছু রীতিনীতি-আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হল। মা-কে সেই অনুষ্ঠানে পূত-পরমান্ন খেতে দেওয়া হল। তাঁকে প্রতি সোমবার উপোস করে থাকতে হত; সারা দিনে কেবল একটি কলা খেতে পেতেন। মা ষষ্ঠীব্রত পালন করতেন (ষষ্ঠী সন্তানের জন্মদান ও শুভাকাঙ্ক্ষী দেবী)।

এসব আচার-অনুষ্ঠান সাঙ্গ হলে এই অভাগী এল মায়ের পেটে। পরিবারের সকলে, গোটা গ্রাম তো খবর পেয়ে আনন্দে আটখানা! তারা যদি আগেভাগে জানত—আসছে এই অভাগী তাহলে তক্ষুণি আনন্দোৎসব বাতিল করে মা-কে পাঠাত নির্বাসনে। গাঁয়ের সকলের খুশি আর ধরে না—ঠাকুর প্রসন্ন হয়েছেন, অবশেষে একটা ছেলে; বংশরক্ষাকারী উত্তরাধিকারী আসছে এতদিনে। মা-ও খুব খুশি। শিবনাথ ঘোষ বংশের প্রথম পুত্রের জন্য বার্ষিক ৫০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি বরাদ্দ করে গেছেন।

ওই উপহার আমার কাছে যে কী মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল সে কথা বলে বোঝানো যায় না। মা একটা ছেলের জন্ম দেবে এই আশায় তাঁকে নিয়ে সে কী মাতামাতি, নাচানাচি। এই উপলক্ষে পুজোপার্বণ, ব্রতপালন, মা-কে ভালোমন্দ খাওয়ানোর যেন একটা ধুম পড়ে গেল। এক সময়ে হইহুল্লোড়ের ইতি হল। দশমাস পেটে থেকে মায়ের তিনদিনের প্রসববেদনার পর আমি জন্ম নিলাম। যখন স্পষ্ট জানা গেল যে মা একটা মেয়ের জন্ম দিয়েছেন, তখন দুঃখে হতাশায় মা বিছানা নিলেন। ঠাকুমা মা-কে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করতে লাগলেন। কিন্তু বাবা এত খুশি হয়েছিলেন যে এক মাস ধরে নহবত বসিয়েছিলেন। আতশবাজির রোশনাইয়ে গোটা গাঁ ঝলমল করে উঠেছিল। আনাচ-কানাচ সহ পুরো বাড়িটাই আলোর মালায় সেজে উঠেছিল। তিনি জনে জনে বলে দিলেন, ‘কেউ আমার সন্তানকে যেন মেয়ে না বলে। অন্যদের ছেলেরা যে সব অধিকার সুযোগসুবিধা পায় আমার মেয়ের অধিকার তাদের থেকে এক রত্তিও কম নয়। আমি মনে করি, ও-ই আমার প্রথম ছেলে। ও ‘মেয়ে’ বলে যে-ই ওকে হেয় করবে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা ঘেন্না করবে; তাকে আমি বরদাস্ত করব না, তার সঙ্গে কোনো যোগ রাখব না।’

তাঁর এমন কথার লক্ষ্য ছিলেন বোধ করি মা। তিনি মা-কে ভর্ৎসনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এসব কথা মায়ের কানেই ঢোকেনি, তিনি সারাদিন কেঁদেই ভাসাতেন। আমি আশ্রয় পেলাম হাড়ি জাতের এক অচ্ছুৎ নারীর কোলে। এক স্তন তাঁর মেয়ের মুখে, (আমার থেকে এক মাসের বড়ো) আরেকটা আমার মুখে। এইভাবে জন্মের পর থেকে আমি মায়ের দুধ পাইনি। তবে কালে কালে তাঁর মনে হয়তো একটু মমতা এসেছিল, তখন কালেভদ্রে আমি তাঁর বুকের দুধ খেতে পেতাম। তবে সে আর কত দিন। আমার সাত মাস বয়সে আমাকে মাই ছাড়িয়ে দেওয়া হল। কারণ মা ফের গর্ভ ধারণ করেছেন। এর পর থেকে আমার পুঁটি-মা (হাড়ি জাতের-মহিলাটি) আমাকে বড়ো করে তুলেছেন।

বাবার আদেশ যেন আমার কাছে এক আশীর্বাদ। আত্মীয়-কুটুম কারোরই সাহস ছিল না আমাকে অবজ্ঞা করার, ঘেন্না করার। প্রত্যেকেই বলে বেড়াত, ‘এ মেয়েকে আমরা কী চোখে দেখি, সেটাই-বা বলি কী করে?’ একদিন বাড়ির চাকর-বাকররা একজোট হয়ে বাবাকে গিয়ে ধরে বসল, ‘নবজাতককে কী নামে ডাকা হবে?’ বাবা তক্ষুণি ব্যাপারটা ফয়সালা করে দিলেন। বললেন, ‘ওকে ডাকবে চুনিবাবু (ছেলের নাম) বলে।’ তাই আঁতুড়ঘরে আমার নাম রাখা হল চুনিবাবু। দেশ-গাঁয়ে এখনও আমাকে লোকে ওই নামেই জানে।

আমার দেড় বছর বয়সে মা অবশেষে তাঁর বহুকাঙ্ক্ষিত পুত্র-সন্তান লাভ করলেন। তার কয়েক মাস আগে আমার ছোটো কাকিমাও একটি ছেলের জন্ম দিয়েছেন। এখন আমার মায়ের কোলে তাঁর একমাত্র ছেলে। আমি তাঁর ধারকাছও মাড়াতাম না। দুধ খাওয়ার ইচ্ছে হলে সোজা চলে যেতাম পুঁটি-মা-র কাছে। বাকি সময়টা আমার কাটত বাড়ির বাইরের ঘরগুলোয় ঘুরঘুর করে। আমার পিসির মেয়ের নাম পান্নাবাবু। আমার নাম চুনিবাবু। ছোটো কাকিমার ছেলের নাম গোপালবাবু আর আমার সহোদর ভাইয়ের নাম দেববাবু। এই দুই পুত্রসন্তানই এ-পরিবারের সবকিছুর উত্তরাধিকারী। কিন্তু এদের জন্ম পরিবারের পক্ষে মোটেই শুভ হয়নি। জমিদারির খাজনার (রাজস্ব) কিস্তি দিতে না পারায় বার্ষিক ৫৬,০০০ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি মাত্র ১৩,০০০ টাকায় বেচে দিতে হল। ওই সম্পত্তি কিনে নিলেন মহারাজা বরদাকান্ত, মহারাজা প্রতাপাদিত্যর উত্তরসূরি। শুরু হল আরেকটা মামলা—বরদাকান্তর বিরুদ্ধে। ওই সময়টাতেই ঠাকুরদার মামলাটা ইংল্যান্ড অব্দি গড়িয়েছিল; তার সঙ্গে জুড়ল এটা। আবার ছোটো তরফের ছোটো ঠাকুমা একটি পুত্র দত্তক নিলেন। এই দত্তক-নেওয়া আইনসম্মতভাবে বাতিল করার জন্য ঠুকে দেওয়া হল আর একটা মামলা। ভূসম্পত্তি হারানো আর মামলা-মোকদ্দমায় জেরবার হয়ে আমাদের আর্থিক অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়ে। মোদ্দা কথা, আমরা ক্রমেই দেনায় ডুবে যেতে থাকলাম। জমিজমা বন্ধক রেখে ধার নেওয়া যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল; কারণ খরচ তো এক পয়সাও কমানোর উপায় নেই। এতদিন ধরে যেসব রীতি-রেওয়াজ আচার-অনুষ্ঠান, পুজোপার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব চলে আসছে, সেগুলো বন্ধ করার তো কোনো কথাই ওঠে না।

এই সময়টাতে সীতানাথবাবুর ছেলেরা সঙ্গে আমার পিসতুতো বোন পান্নাবাবুর বিয়ে হয়। সীতানাথবাবু নড়াইল-এর জমিদার রতনবাবুর ভাগনে। এই বিয়েতে ৫০,০০০-এরও বেশি টাকা খরচ করা হয়েছিল। এ টাকাও জোগাড় হয়েছিল জমিজমা বন্ধক রেখে। এই রকম খারাপ সময়েও আমাদের পোষা লেঠেল ছিল ৫০০ জন। তাদের কাজকম্ম কিছুই ছিল না। কালেভদ্রে সময়মতো খোরপোশের টাকাপয়সা পেত। লেঠেলরা সকলেই মুসলমান। ওদের বরখাস্ত করার কোনো পথ আমাদের খোলা ছিল না, কেননা তাহলেই ওরা শত্রুপক্ষে যোগ দেবে আর আমরা সমূলে বিনষ্ট হব।

এই সময়েই আমার ছোটোকাকার ছেলের অন্নপ্রাশন আর নামকরণ অনুষ্ঠান হল। লাঠিয়ালরা পেট পুরে খেতে পায়নি বলে খুব রেগে গেল। আমাদের অনেক আত্মীয়-কুটুম এই অনুষ্ঠানে প্রচুর গয়নাগাঁটি পড়ে সেজেগুজে এসেছিল; পরিবারের মেয়ে-বউরাও গয়নাগাঁটি পরে সাজগোজে কিছু কম যায়নি। লাঠিয়ালরা আর লোভ সামলাতে না পেরে খোদ মালিকের বাড়িতেই লুঠতরাজ চালাল। জেনানাতে (অন্দরমহলে) যেহেতু কোনো পুরুষমানুষের ঢোকার এক্তিয়ার নেই তাই লুটেরারা বিনা বাধায় লুটপাট চালিয়ে যাবতীয় গয়নাগাঁটি দামি পোশাক-আশাক, অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল। যে-সব মহিলা অতিথিরূপে এসেছিলেন, পরিবার থেকে তাদের দামি পোশাক ও গয়নার পুরো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল। সর্দার লাঠিয়ালকে তলব করে সরাসরি বলা হল 'আমাদের নুন খেয়ে আমাদেরই সর্বনাশ করলে? কাজটা তো তোমরা ঠিক করোনি।' সর্দার উত্তরে বলল, 'হুজুর, আমরা অভাবি মানুষ—মাথার ঠিক নেই, কী করতে কী করে ফেলেছি। এ-কাজ করা উচিত হয়নি। আমাদের মাপ করে দিন।'

আমি জানি না, কতশত হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। এমনকী ওই দুঃসময়েও বাড়ির রীতি-রেওয়াজ পূজাপাঠ, আচার-অনুষ্ঠান ঠিক আগের মতোই চলছিল। কোথাও কোনো ব্যত্যয় হয়নি। আমি সারাটাদিন বাইরের ঘরগুলোতেই কাটাতাম। আমার তখন ছ-সাত বছর বয়স—এর মধ্যেই আমার দুই ভাই। বাড়ির মেয়ে-মহলে ভাইদের কদরই আলাদা। তবে আমিও বাবার ন্যাওটা–ছেলেদের পোশাক পরে বাড়ির বারমহলে ঘুরে বেড়াতাম। মেয়ে বলে আমার লেখাপড়া করার কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু একজন মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আমার খুব দহরম-মহরম, কেননা আমি তাঁকে বাবার সুগন্ধি অম্বুরি তামাক এনে দিতাম। অবরে-সবরে ভালোমন্দ এটা-সেটাও দিতাম। সব মাস্টারমশাই আমাকে ভালোবাসতেন —হয়তো আমি বাবার প্রিয় বলে, হয়তো অন্য কোনো কারণে—আমি জানি না। আমার পাঁচ বছর বয়সে কার্তিক মাসে বিপুল এক ঝড় হয়েছিল। তার আগে পরপর দু-বছর অজন্মা। খেতে একদানা ফসল ফলেনি। ফলে দেশে নেমে এল বিরাট দুর্ভিক্ষ। খেতে না পেয়ে মানুষজনের পাগলপারা দশা। চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি আকচার ঘটতে লাগল—এসবের আর কোনো সীমা-পরিসীমা রইল না। আমার বাবা গ্রামবাসীদের জন্য দুটো শস্যগোলা খুলে দিলেন। কিন্তু ওই সামান্যতে আর কতটুকু কী হবে? সারা দেশ জুড়ে তখন দুর্ভিক্ষ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে যুঝবে কে?

এই দুর্ভিক্ষই হল বিখ্যাত ৭৬-এর মন্বন্তর। আমার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। আমি ভাঁড়ারে ঢুকে, অনেকটা পরিমাণে চাল চুরি করে গরিব গ্রামবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতাম। চাল চুরি করাই তখন আমার ধ্যানজ্ঞান। বাড়ির কাকপক্ষীও একথা জানত না। একবার কি দু-বার ভাঁড়াররক্ষক ধনাই বাবাকে নালিশ করে যে চুনিবাবু রোজই ভাঁড়ারঘর থেকে চাল চুরি করে। বাবা কিন্তু আমাকে কিচ্ছুটি বলেননি। তিনি কেবল জানতে চাইলেন, 'চাল দিয়ে তুমি কী করো?' আমি সাদাসাপটা স্বীকার করলাম, বললাম 'হাড়ি-পাড়ায় গিয়ে দেখি, তাদের ঘরে এক দানাও চাল নেই, ওরা কন্দমূল (taro) সেদ্ধ করে খেয়ে খিদে মেটাচ্ছে। সে জন্যেই আমি চাল নিয়ে ওদের দিয়ে দিই।' শুনে বাবা বললেন, 'খুব ভালো কাজ করেছ।' দ্বিগুণ উৎসাহে আমি আরও বেশি বেশি করে চাল নিতে থাকলাম। কারও কিচ্ছুটি বলার নেই। শুধু চাল দিয়ে কি আমার শান্তি আছে। বাড়ি থেকে মাদুর, বালিশ, তোশক নিয়ে, যাদের নেই তাদের দিয়ে দিতাম। শিগগিরই ধরা পড়ে মায়ের কাছে জোর পিটুনি খেলাম। কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্রী আমি নই।

এক বছর ধরে মন্বন্তর গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে দাপিয়ে বেড়িয়েছিল। মানুষের যে কী অসহনীয় করুণ অবস্থা। এক দানা চাল বা ধানের জন্য হাপিত্যেশ করে মাথা কুটলেও তা মেলে না। এমন সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ আমি এর আগে বা পরে কখনো দেখিনি। কেউ কি দেখেছে? এক দুর্ভিক্ষে দেশটা ছারখার হয়ে গেল। প্রথমে এই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ, পেছন-পেছন এল রোগবালাই আর মহামারী। সে সময়ে এদেশে ডাক্তার ছিল না। গাঁয়ে ডাক্তার বলতে বরদা কবিরাজ আর ছুটে ফকির। আন্ত্রিক রোগে গাঁয়ের মানুষ পটাপট মরতে লাগল। তাঁতিপাড়া মহামারীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাবা যখন দেখলেন মহামারীতে লোকজন নির্বিচারে মারা যাচ্ছে তিনি কবিরাজ আর হেকিমদের চিকিৎসা করা বন্ধ করে দিলেন। গাঁয়ের বহু মানুষ

মারা গেল; বহু মানুষ গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেল। বাবা সেনহাটির কৃষ্ণদাস পাল ও পিতাম্বর সেনকে ডেকে এনে গাঁয়ে থাকার বন্দোবস্ত করলেন। তাঁদের সুচিকিৎসায় ধীরে ধীরে আমরা মহামারীর হাত থেকে রেহাই পেলাম।

এই দুর্যোগের সময়টাতে ছোটো তরফের পরিবারটি গ্রাম ছেড়ে নলহাটিতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। যখন নিজেদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা চলছে তখন পড়শি হিসেবে বসবাস করাটা কেমন বেমানান ঠেকে। ছোটো তরফের দু-জন ঠাকুমা—একজন সেজো ঠাকুমা আর একজন ছোটো ঠাকুমা। ছোটো ঠাকুমাই দত্তকপুত্র নিয়েছিলেন। সেজো ঠাকুমার মেয়ের নাম শুভঙ্করী আর দত্তকপুত্রের নাম মথুরানাথ ঘোষ। বয়সে তিনি আমার বাবার থেকে বড়ো। তাঁকে ঘিরে শরিকদের মধ্যে জোর মামলা-মোকদ্দমা বেধে গেল। দুটো মামলা ছিল মহারাজার বিরুদ্ধে আর দুটো শরিকদের মধ্যে। যশোরে কলকাতায়—দু-জায়গাতেই মামলার শুনানি চলত। যশোরে আমাদের উকিল ছিলেন উমেশ ঘোষ। হাইকোর্টের উকিল ছিলেন শ্রীনাথ দাস। তিনি মামলায় বড়ো বড়ো ব্যারিস্টারও নিয়োগ করতেন। বরিশালের দুর্গামোহন দাশও* আমাদের একজন উকিল ছিলেন। মামলা-মোকদ্দমায় জেরবার হয়ে আমাদের পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ল।

এই উকিলরা মনের সাধে তাঁদের পকেট বোঝাই করে নিতেন। নগদ টাকায় তাঁদের ফি দিতে না পারলে তাঁরা সোৎসাহে জমিদারি-ভূসম্পত্তির অংশবিশেষ ফি-হিসেবে নিয়ে নিতেন। এইভাবে বাবা-কাকাদের সম্পত্তি একেবারে তলানিতে এসে ঠেকল। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমার কোনো কমতি নেই। একের পর এক তা বেড়েই চলল। কখনো হাইকোর্টে আপিল, কখনো বা ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিল-এ। কখনো জজ কোর্টে দেওয়ানি ফৌজদারি দু-ধরনের মামলাই চলতে থাকে—-যেন বা অনন্তকাল ধরে। এমন মোকদ্দমার ফেরে পড়ে ক-জন মানুষই বা টিকে থাকতে পারে? আমরা ধীরে ধীরে নিঃস্ব হতে থাকলাম। মন্দিরের ঢালাও ব্যবস্থা, জাঁকজমক ক্রমেই কমে আসতে লাগল। পঞ্চাশটার বদলে এখন রোজ মাত্র দশজন বামুনের পাত পড়ে। আত্মীয়-কুটুম, অতিথিদের আর আগের মতো রাজসিক ব্যবস্থাপনায় রাখা যায় না। দেনা বাড়ছে চড়চড় করে। তা সত্ত্বেও পুজোপাঠ, উৎসব-অনুষ্ঠান নমো নমো করে হলেও সারতে হচ্ছে। কেননা আমরা তো এখনও হতদরিদ্র হয়ে পড়িনি। কিন্তু দেনার পরিমাণ এমন বিশাল আকার নিয়েছে যে ভূ-সম্পত্তির বার্ষিক আয়ে তার কিছুই প্রায় মেটানো যাচ্ছে না। একদিকে যেমন মামলা-মোকদ্দমার বহর বেড়েই চলেছে তেমনি অন্যদিকে মাথার উপর ঠাকুরদেবতারা তো আছেনই—দেবদেবীদেরই-বা ত্যাগ করি কী করে! এই কঠিন অবস্থাতেও তাই সবকিছুই যেমন চলছিল, তেমনটা না হলেও চালাতে তো হচ্ছে। পরিবর্তন বলতে তেমন কিছুই হয়নি। দেনার সুদ-ই বছরে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০,০০০ টাকা। এবার তহবিল-ঘাটতিতে পরিবারের দৈনন্দিন খরচখাতে হাত পড়েছে। আমাদের চাকরবাকরদের মাইনে দিতে হত না, কারণ তাদের সকলকে নিষ্কর-জমি দেওয়া আছে। বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াল এত বড়ো একটা পরিবারের রোজকার খরচ সামাল দেওয়া যাবে কী করে? আর ঠিক এই কঠিন সময়টাতেই বাবার জীবনে ঘনিয়ে এল ভয়ানক সব দুর্যোগ। কথায় আছে না: বিপদ যখন আসে, একা আসে না, চারদিক থেকেই আসে । (চলবে)

*দুর্গামোহন দাশ (১৮৪১-১৮৯৭) কলকাতা হাইকোর্টে ১৮৬০-এর শুরুর দিকে ওকালতি করতেন। ১৮৬৩ সালে তিনি বরিশাল ফিরে যান। ১৮৭০-এ ফের কলকাতায় ফিরে আসেন। একজন নামকরা উকিলরূপে তিনি প্রতিষ্ঠা পান। তবে তিনি আরও খ্যাতি পান বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ দেওয়ার প্রয়াসের জন্য; বিশেষ করে তাঁর বিধবা সৎ-মার পুনর্বিবাহ দেওয়ার জন্য। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। কলকাতায় তিনি বিধবাদের আশ্রয়দানে এবং শিক্ষাদানে উদ্যোগী ছিলেন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক প্রাবন্ধিক, অভিধানকার ও গ্রন্থ সম্পাদক

Advt.

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হল একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহণ ও মেডিক্যাল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হবে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজনে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

উৎপল মণ্ডল, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন: ৯০৮৮০৫০৫২৫, ৯০৭৭৯৩৩৩২

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ভুলে যাওয়ার যন্ত্রণা। ভুলতে দেখার যন্ত্রণা। মেয়েদের কথা ভাবে কে?

শ্রী মুখোপাধ্যায়

স্নান করবেন বলে বাথরুমে ঢুকেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত দুঁদে বিচারপতি। স্নান সেরে আধ ঘণ্টা পর বাথরুম থেকে বেরোলেন। কিন্তু শরীরে তখন এক টুকরো সুতোও নেই। স্নান করার পরে যে ফের পোশাক পরতে হয়, সেটাই ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। রোগটার নাম অ্যালজাইমার্স। কিছুদিন ধরেই অস্তিত্ব জানান দিচ্ছিল। এক সময়ে তেড়েফুঁড়ে উঠে জানিয়ে দিল, সবটাই আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

তার পরের কয়েকটা বছর ভয়াবহ। হা-হুতাশ, সমবেদনা, করুণা, আক্ষেপ সবই চলল বিভিন্ন মহলে। ছেলেমেয়েরা দেশের বাইরে। স্মৃতি হারানো স্বামীকে আগলে রেখেছিলেন একা তার স্ত্রী। যাঁর বয়স ৭৫। আচমকা এই মানসিক ধাক্কা তিনি কী ভাবে সামলাবেন, সেই খবর আলাদা করে কেউই রাখার প্রয়োজনবোধ করেননি।

এমনিতেই পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অ্যালজাইমার্সে বেশি আক্রান্ত হন। তার ওপরে অ্যালজাইমার্স রোগীদের 'কেয়ার গিভার'ও মূলত মহিলারাই। আক্ষরিক অর্থেই সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ সামলানোর পাশাপাশি যে সামাজিক চাপ তাঁদের সামলাতে হয়, তার কোনো তুলনাই হয় না। দিনের পর দিন স্মৃতিভ্রংশের রোগীদের সামলাতে গিয়ে যে একঘেয়েমির মধ্যে দিয়ে তাঁদের যেতে হয়, মনের মধ্যে যে পাথর ক্রমশ আরও ভারী হতে থাকে, তা ভাগ করে নেওয়া তো দূরের কথা, বোঝার মতোও কাউকে পাওয়া যায় না। কখনো স্ত্রী, কখনো মেয়ে, কখনো পুত্রবধূকে নিরন্তর এই সেবার কাজ করে যেতে হয়। শুধু বাড়ি নয়, ডে-কেয়ার হোম বা হাসপাতালেও এই ধরনের 'কেয়ার' দেন মহিলারাই। অথচ কখনো এটা 'জেন্ডার ইস্যু' হয়ে ওঠে না। আর তাই স্মৃতি-হারানো স্বামীকে প্রতিদিন নিজেকে চেনাতে চেনাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে বৃদ্ধা স্ত্রী, তাঁর ক্লান্তি একান্ত তাঁর নিজেরই থাকে। কিংবা স্মৃতিভ্রষ্ট প্রায়-স্থবির বাবা বা মাকে প্রতিদিন স্নান করানো, খাওয়ানোর পাশাপাশি বাড়িতে দিনরাত পাহারা দেওয়া, চারপাশের জগতের নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচিয়ে রাখাটাই যে মেয়ে বা পুত্রবধূর দায়িত্ব, তাঁদের দিনযাপনের একঘেয়েমিও কখনো আলোচনায় আসে না।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে, স্মৃতিভ্রংশের ক্ষেত্রে মহিলাদের চিকিৎসাও বড়ো রকমের অবহেলিত। অল্প-অল্প ভুলতে থাকা শুরু হলে পুরুষদের যতজনকে তবু পরিবারের লোকেরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান, মহিলাদের ক্ষেত্রে তার অনুপাতটা অনেক কম।

ছেলে-বউমা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পরে একটা বাজারের থলে হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরতে পারেননি ষাটোর্ধ্বা গৃহবধূ। কারণ, বাড়ির ঠিকানাটাই আর মনে ছিল না তাঁর। হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলেন অনেকটা দূর। হাঁটতে হাঁটতেই বাসের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিলেন। তাঁরও সব ভুলে যাওয়ার গভীর অসুখ ছিল। কিন্তু সেটা বাড়িতে তেমন গুরুত্ব পায়নি। 'বয়স বাড়লে অমন সকলেরই হয়', এই ধারণা থেকেই তাঁর চিকিৎসা করানোর কথা ভাবেননি কেউ। এমনকী, তাঁর স্বামীও নন। যদিও তিনি নিজে ডাক্তার ছিলেন।

আরেকজনের জীবনের গল্প এখানে না বললেই নয়। তাঁর নিজের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। কিন্তু স্মৃতি-হারানো অন্য বহু মানুষের জন্য নিজের জীবনের অনেকটা সময়ই খরচ করেছিলেন তিনি। শেফালি চৌধুরী। কলকাতায় অ্যালজাইমার্স অ্যান্ড রিলেটেড ডিসঅর্ডার সোসাইটি-র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯৯৯ সালে। তারও বছর আটেক আগে তাঁর মেয়ে দীপিকা অ্যালজাইমার্সে আক্রান্ত হন। কী এর চিকিৎসা, কীভাবেই বা পরিচর্যা হওয়া দরকার, সেসব ভেবে কোনো কুল পাচ্ছিলেন না। ক্রমশ বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে খোঁজ করে জানলেন, তিনি একা নন। আরও অনেকে রয়েছেন তাঁর মতো দিশাহীন অবস্থায়। কিন্তু এ রাজ্যে বিষয়টি নিয়ে ন্যূনতম সচেতনতাও না থাকায় অসহায়তার মাত্রাটা বেশি। তখনই তাঁর মনে হয়, এই সব ভুক্তভোগী মানুষদের একটা 'কমন প্ল্যাটফর্ম' দরকার। সেই ভাবনা থেকেই জন্ম নেয় ওই সংগঠন।

কাজের জন্য যখন চতুর্দিকে ছুটে বেড়াতেন, তখন নানা সময়ে বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। বলেছিলেন, "আমার মেয়ে একটা বড়ো প্রতিষ্ঠানে খুব বড়ো পদে চাকরি করত। সব ভুলে যাচ্ছিল। অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে ভুলে যেত কোথায় যেতে হবে। ওদের অফিসের গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের দিন সমস্ত জিনিসপত্র আলমারিতে তালা দিয়ে রেখে বাড়ি চলে এসেছিল। তখনই বুঝেছিলাম, লড়াই শুরু হল আমার।"

লড়াই কি একটা? একদিকে সমাজে সচেতনতা তৈরির লড়াই। অন্যদিকে মেয়েকে ভালো রাখার লড়াই। যতক্ষণ বাড়িতে থাকছেন ততক্ষণ শয্যাশায়ী মেয়ের পরিচর্যা, বাড়ির পরিচারিকাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অ্যালজাইমার্স রোগীদের যে বিশেষ ধরনের পরিচর্যা দেওয়া দরকার, তা রপ্ত করানো, সংগঠনের কাজে দূরদূরান্তে ছুটে যাওয়া, সরকারি-বেসরকারি স্তরে এই রোগ সম্পর্কে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া, আরও কত কী! নিজের বাড়িতেই গোড়ায় শুরু করেছিলেন অ্যালজাইমার্স সোসাইটি দফতর। পরে তা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। চালু হয় অ্যালজাইমার্স রোগীদের জন্য ডে কেয়ার হোম-ও। যাঁকে কেন্দ্র করে এত কিছুর সূচনা, সেই দীপিকার মৃত্যু হয় ৭৩ বছর বয়সে। শেফালীদেবীর বয়স তখন ৯৩।

ওই বয়সেই জীবনের দ্বিতীয় লড়াইটা শুরু করেন তিনি। তখন আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না। একটানা বেশিক্ষণ বসতেও কষ্ট হয়। তবু মেয়ের মৃতদেহ শ্মশানযাত্রায় পাঠানোর পরেও তাঁর মেয়ের মতো আরও যে অসংখ্য মানুষ এই রোগের শিকার, তাঁদের জন্য কাজটা চালিয়ে নিয়ে

গিয়েছিলেন। বছর কয়েক আগে শেফালিদেবীর মৃত্যু হয়েছে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ''সারা দিন নানা কাজে ছুটে বেড়াই। আলাদা করে নিজেকে নিয়ে কিছু ভাবার ফুরসত পাই না। কিন্তু দিনের শেষে ভাবতে বসি, আমার যন্ত্রণার কথা কাকে বলব?''

সরকারি বা বেসরকারি তরফে এই রোগ নিয়ে তেমন কোনো প্রচারই নেই। নেই পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্রও। ছোটো ছোটো পরিবার সর্বত্র। সেখানে হয়তো সকলেই চাকরিতে বেরিয়ে যায়। ছোটোরা স্কুল-কলেজে। স্মৃতি-হারানো মানুষদের কার ভরসায় রেখে বেরোবেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা? বাড়িতে থাকলে যেকোনো সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, আর রাস্তায় বেরোলে তো কথাই নেই। অ্যালজাইমার্স সোসাইটি এঁদের কথা ভেবেই ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করেছে। কিন্তু একটা সংগঠনের উদ্যোগে কতটুকু সমস্যা মিটবে? বিশেষজ্ঞরা বলেন, পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে এই রোগের চিকিৎসা সম্ভব নয়। এমন একটা ফোরাম দরকার যেখানে মনোবিদ, স্নায়ু চিকিৎসক, স্মৃতিভ্রংশের রোগী, তাঁদের পরিবারের লোকেরা, এমনকী প্রতিবেশীরাও সকলে একত্রিত হতে পারবেন। কিন্তু সেই ফোরাম গড়ার উদ্যোগই বা কতখানি রয়েছে? আর গড়লেও সেখানে এগিয়ে আসার মতো মানুষই বা ক-জন?

তা ছাড়া সকলেই তো অ্যালজাইমার্স রোগে আক্রান্ত হন না। আরও অনেক কম মাত্রার ভুলের অসুখ এখন বাসা বেঁধেছে আমাদের চারপাশে। সেই সব ভুলে যাওয়ার অসুখও তোলপাড় করে দিতে পারে এক‌েকটা জীবন। বিপন্ন করতে পারে বহু অস্তিত্ব।

কেন বাড়ছে এত ভুল? মনের ডাক্তাররা বলেন, এর মূল কারণ বাড়তে থাকা মানসিক চাপ। অফিসের চাপ, বাড়ির দায়দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, কোনোটাকেই অবহেলা করার জো নেই। এত কিছুকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে যেটা অবহেলিত হয় তা হল নিজস্ব সময়।

কেন ভুলে যায় মানুষ? বহু ক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনার জেরে স্মৃতি চলে যায়। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন ঠিকঠাক না ঘটলে স্মৃতি নষ্ট হতে পারে। চিকিৎসা পরিভাষায় তার নাম 'ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া'। স্ট্রোকের ফলে রক্ত চলাচলে অনেক সময়ে বড়ো ধরনের বাধা পড়ে। স্মৃতিহারানোর মূল কারণ হিসেবে গণ্য হয় 'নিউরো ডিজেনারেটিভ ডিজিজ'। এ ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কোষগুলি দ্রুত ক্ষয়ে যেতে থাকে। শরীরে জরা আসার আগেই মস্তিষ্ক ছেয়ে যায় জরায়। আবার গভীর অবসাদে, অতিরিক্ত মদ্যপানে, কোনো কড়া ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতেও স্মৃতি কমজোরি হতে পারে। কিছু জটিল অসুখের জেরেও স্মৃতি হারানোর ভয় থাকে। ডাক্তাররা বলেন, রোগটাকে গোড়াতেই যদি ধরে ফেলা যায় তা হলে তার দ্রুত চিকিৎসাটা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে রোগটা নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার ভয়টা কিছুটা কমে।

আবার হয়তো তেমন বড়ো কোনো অসুখ নয়। এমনিই অনেক কিছু ভুলে যান অনেকে। যে কথা সে দিন সকালেই বলা হয়েছে, রাতেই সেটা বেমালুম ভুলে গেছেন এবং ভুলে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছেন পরিবারে, এমন লোকজন তো আমাদের কারওরই অচেনা নয়।

এখানে মহিলাদের কথা আলাদাভাবে বলা হচ্ছে, কারণ মহিলাদের ভুলে যাওয়ার সমস্যা সম্পর্কে সমাজের সহনশীলতা, সহানুভূতি অনেক কম।

একটা সময় পর্যন্ত চালু যুক্তি ছিল, মানুষ সেটাই ভুলে যায় যেটাকে সে গুরুত্ব কম দেয়। শয্যাশায়ী স্বামীকে সারা বছর ঘড়ির কাঁটা ধরে যে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধটা দেন তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী, একদিন কেন তিনি সেটা আচমকাই ভুলে যান, তার ব্যাখ্যা কী? হঠাৎই একদিন তাঁর স্বামীর গুরুত্ব তাঁর কাছে কমে গিয়েছিল এমনটা নিশ্চয় কেউ ভাবতে পারবেন না।

এক বৃদ্ধাকে জানি। পুত্রবধূর জন্মদিনে তার জন্য পায়েস রেঁধেছিলেন যত্ন করে। কিন্তু সেই সকালেই শহরের অন্য এক প্রান্তে একটি বাড়িতে থাকা বউমাকে যখন ফোন করেছিলেন, তখন বিস্তর কাজ-অকাজের কথা বললেও জন্মদিনের প্রসঙ্গটা তাঁর মাথাতেই ছিল না। শেষ পর্যন্ত পুত্রবধূই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন শাশুড়িকে, যে সে দিনটা তাঁর জন্মদিন। এ কেমন ভুলে যাওয়া, জন্মদিনের কথা ভেবে পায়েস রাঁধার কথা মনে রইল, অথচ আশীর্বাদ/শুভেচ্ছার কথা ভুলে গেলেন? লজ্জিত বৃদ্ধা বার বার তাঁর প্রিয়জনদের কাছে ওই প্রশ্ন করেছেন। উত্তর পাননি। পাওয়ার কথাও নয়।

সমস্যা হল, এই ভুলো মানুষেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চারপাশের লোকজনের কাছ থেকে সহানুভূতি পান না। উলটে জোটে টিকাটিপ্পনী, ব্যঙ্গ, কটু কথা। ''নিজের বিষয়গুলো তো দিব্যি মনে থাকে। যত ভুল সব অন্যদের বেলায়''। ভুলো মানুষটি আদতে কতটা স্বার্থপর এবং সুযোগসন্ধানী তা প্রমাণ করার জন্য যুক্তির বান বয়ে যায়। এক বৃদ্ধার আক্ষেপ শুনেছি, ''আমাদের মতো বয়স হোক, তখন বুঝবে এই ভুলে যাওয়াগুলো বদমায়েশি নয়, অসহায়তা।''

ছোটোবেলায় স্কুলের নীচু ক্লাসে 'নিজে পড়ো' বইয়ে পড়েছিলাম এক ভুলো মানুষের কথা। ভোলা লোকটি বড়ো ভোলা ছিলেন। তিনি সব কিছু ভুলে যেতেন। একদিন লাঠি নিয়ে বাইরে বেরিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে খাটের উপরে লাঠিটাকে শুইয়ে রেখে নিজে দাঁড়িয়ে পড়লেন ঘরের কোণে। গল্পটা পড়ে ছোটোবেলায় বেদম হাসি পেত। এখন গল্পটার কথা মনে পড়লে অদ্ভুত একটা কষ্ট হয়। যে কষ্টের কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

সব ভুলে যাওয়ার কি চিকিৎসা হয়? হয় না। সব ভুলে যাওয়া কি চিকিৎসাতেই সারানো সম্ভব? সম্ভব নয়। বড়ো ধরনের স্মৃতিভ্রংশের চিকিৎসা থাকে। সেটা কখনো সারে, কখনো সারে না। কিন্তু বিভিন্ন বয়সে দৈনন্দিন জীবনযাপনে ছোটোখাটো নানা ভুলে যাওয়া ঘটতে থাকে। ঘটতেই থাকে। সেগুলো মেনে নিতে শিখতে হয় কাছের মানুষদেরই। পরম যত্নে সেই ভুলে যাওয়া বিষয়গুলোর সূত্র ধরিয়ে দিয়ে কাঁধে ভরসার হাতটা রাখতে হয়। পারিপার্শ্বিক চাপ আমাদের এতটাই ধৈর্যহীন করে দিয়েছে যে পরম প্রিয়জনের ক্ষেত্রেও আমরা তা করে উঠতে পারি না।

এই ব্যর্থতাও কিছু কম বেদনার নয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখিকা প্রাবন্ধিক।

বাচ্চার সর্দিকাশি

ছোটো ছোটো বাচ্চাদের বার বার সর্দি, হাঁচি-কাশি—এসবে মা-বাবারা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তার ওপর যদি সর্দি 'পেকে' হলুদ হয়ে যায়, কিংবা রাত্রে শ্বাসের সঙ্গে ঘড়ঘড় শব্দ হয়—তবে সেই উদ্বেগ গিয়ে দাঁড়ায় আতঙ্কে। আর এর ফল হল অতি-চিকিৎসা—পাড়ার ওষুধের দোকানদার থেকে বড়ো বড়ো ডিগ্রিধারী স্পেশালিস্ট—সবাই একটা করে অ্যান্টিবায়োটিক বাচ্চাকে দেন খাইয়ে। অথচ এটা একটু বুঝতে পারলে ভয় কমে, বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করে শিশুর ঝুঁকিও কমে—লিখেছেন **ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে**।

শিশুদের শারীরিক অসুস্থতার কথা উঠলেই প্রথমে যে সব সমস্যাগুলোর কথা সাধারণভাবে বাবা মায়ের মনে আসে তার মধ্যে অন্যতম হল ঘনঘন কফ সর্দি। নাকের তলা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত সমান্তরাল প্রবাহধারা অনেক বাচ্চারই বারোমাসের ব্যাপার— পাতলা-ঘন, কাঁচা-পাকা, সাদা-হলুদ, সরু-মোটা নানাবিধ তার প্রচলিত প্রকারভেদ। শরীরে অবস্থান নিয়েও নানা মুনির নানা মত। কখনো সে শুধুই নাকে, কখনো গলায় আবার কখনো পৌঁছে যায় বুকের ভিতর পর্যন্ত। কিছুক্ষেত্রে সে কাঁচা অবস্থায় বুকে ঘড়ঘড় করে আবার কখনো সে নাকি শুকিয়ে বুকে বসে যায়। আবার কিছু কিছু অদ্ভুত চিকিৎসায় নাকি বুকের সর্দি গলা দিয়ে উঠে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বাচ্চাদের কফ সর্দি নিয়ে আমাদের অজ্ঞানতাই এই সমস্ত উদ্ভট চিন্তাভাবনার জন্ম দেয় ও অকারণ শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আসুন কয়েকটা সহজ প্রশ্নোত্তরে আমরা ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি।

১. সর্দির উৎপত্তি কোথায় বা তৈরি হয় কোথায়?

আমাদের শ্বসনতন্ত্রের পুরো ভিতরের দেওয়ালটা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এক ধরনের বিশেষ শ্লেষ্মা তৈরির (Mucous producing) কোষ (গবলেট কোষ)। শ্লেষ্মা বা মিউকাস (Mucous) হল এক প্রকার পিচ্ছিল তরল জাতীয় পদার্থ যার মূল কাজ হল নিশ্বাসের সময় বাতাসকে উষ্ণ ও আর্দ্র করা এবং একই সঙ্গে বাতাসের বিভিন্ন ভাসমান জীবাণু ও ধূলিকণাকে শরীরে প্রবেশ করতে না দেওয়া।

নাকের ভিতর আঙুল দিলে যে ভিজে ভাবটা থাকে তা এই শ্লেষ্মার জন্যই। আবার এই শ্লেষ্মাস্তর 'সিলিয়া' (cilia) নামে একপ্রকার কোষীয় অনুপদের দ্বারা চালিত হয়ে গলার দিকে পৌঁছোয় ও পেটে চলে যায়। তবে জেনে রাখা ভালো শ্লেষ্মা তৈরির গবলেট কোষ আমাদের শ্বসনতন্ত্র ছাড়াও আরও অনেক জায়গাতেই আছে, যেমন ক্ষুদ্রান্ত্র, চোখ, মুখের লালা ইত্যাদি।

আমাদের অতি পরিচিত সর্দি এই নাকের শ্লেষ্মা তৈরির কোষগুলির অতি সক্রিয়তারই ফলাফল।

২. কী কী কারণে এই শ্লেষ্মা তৈরি অতিরিক্ত বেড়ে যায়?

অনেক কারণেই এই শ্লেষ্মা তৈরির হার বেড়ে যেতে পারে। তবে মূলত দু-টি কারণে শিশুদের এই ঘটনা হয়। প্রথমত জীবাণু সংক্রমণ এবং দ্বিতীয়ত অ্যালার্জি।

'কমন কোল্ড' (comon cold) বা সাধারণ সর্দিকাশি প্রায় সবক্ষেত্রেই এটি সম্পূর্ণরূপে ভাইরাস সংক্রমণ। পরিবেশে ২০০-রও বেশি প্রজাতির ভাইরাস আছে যারা এই রোগ ঘটায়। শিশুর নাক থেকে সর্দি ঝরে ও সঙ্গে অল্প জ্বর ও অনুষঙ্গ হিসেবে কখনো অল্প কাশি। নাক বন্ধ থাকা, মাথা যন্ত্রণা, চোখ থেকে জল পড়া, অতিরিক্ত হাঁচি হওয়া ইত্যাদি উপসর্গগুলি দেখা যায়। এই 'কমন কোল্ড' রোগটিই আমাদের কাছে ঠান্ডা লাগা বলে পরিচিত। এটি সাধারণত বছরের শেষের দিকে অর্থাৎ বসন্তকালে বা শীতের শুরুতে বা বর্ষাকালে বেশি হয়। তবে সারাবছরও হতে পারে।

একটি শিশু গড়ে বছরে ছয়-আট বার এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এমনকী তা বছরে বারো বারও হতে পারে। তিনবছর বয়স পর্যন্ত এই হার অত্যন্ত বেশি থাকে এবং তারপর ক্রমশ কমতে থাকে এবং প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় বছরে এক-দুই বারের বেশি হয় না। এর কারণ হিসাবে বলা যায় শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অপরিণত অবস্থা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অপরিণত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immune system) পরিণত হয় এবং ভাইরাসের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে এক সময় রোগ হবার প্রবণতাও কমতে থাকে।

তবে মনে রাখা ভালো যে এই রোগটি নাক থেকে গলার মধ্যেই থাকে। বুকে পৌঁছোয় না, তাই ঠান্ডা বুকে বসার কোনো সম্ভাবনা নেই।

কোনো জটিলতা, যেমন ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ, না হলে শতকরা ১০০ ভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগ নিজে থেকেই নিরাময় হয়ে যায়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল অ্যালার্জি। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু থেকে এই অ্যালার্জি হতে পারে তবে সর্দি কাশি হবার জন্য মূলত বায়ুবাহিত নানা অ্যালার্জিকারক বস্তু (allergen) দায়ী। এই রোগে বাচ্চার বারে বারে হাঁচি

হয়, নাক থেকে ক্রমাগত জল পড়ে ও নাকের ভিতর চুলকায় বা সুড়সুড় করতে থাকে। তবে লক্ষণীয় এতে কিন্তু জ্বর থাকে না। এর সঙ্গে সামান্য গলা খুশ খুশ থাকতে পারে। অ্যালার্জিক সর্দি (allergic rhinitis)-এর সঙ্গে হাঁপানি বা অ্যাজমার একটা সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু দুই ক্ষেত্রেই বায়ুবাহিত 'অ্যালার্জেন'গুলো একই, তাই দেখা গেছে ওই অ্যালার্জিক সর্দিতে আক্রান্ত শতকরা ৩০ ভাগ বাচ্চার শ্বাসনালীর অতি-সক্রিয়তা (Hyperactive airway) রোগও থাকে। সেরকম থাকলে অ্যালার্জিক সর্দির উপসর্গগুলোর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার কাশি, শ্বাসকষ্ট, নিশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দও হয়। ঋতুপরিবর্তনের সময় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। তবে সারা বছরও এই রোগ লেগে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্রমাগত নাক চুলকানোর জন্য চোখের নীচে কালো দাগও পড়ে যায়।

এই দু-টি অর্থাৎ অ্যালার্জিক সর্দি ও 'কমন কোল্ড' ছাড়াও আরও কিছু কারণে নাক থেকে সর্দি ঝরতে পারে।

যেমন অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাসে থাকলে বা অনেকক্ষণ বাচ্চা কাঁদলে নাকের শ্লেষ্মা কোষগুলো অতিরিক্ত কাজ করতে থাকে ও নাক থেকে জল পড়ে। আবার মস্তিষ্কের তরল নাক দিয়ে বেরোনো (CSF Rhinorrhea) -র মতো বিরল রোগেও নাক থেকে জল পড়ে।

৩. 'বাচ্চার ঠান্ডা লাগার ধাত' কথাটা খুব চালু। এ কথাটার মানে কী ও কী করণীয়?

এতক্ষণের আলোচনায় দেখলাম শিশুদের ঠান্ডা লাগার মূল কারণ দুটো—ভাইরাসজনিত 'কমন কোল্ড' ও অ্যালার্জি।

'কমন কোল্ড'-এর মতো উপসর্গগুলি হলে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করালে দিন কয়েকের মধ্যেই বাচ্চা সুস্থ হয়ে যায়। এই রোগটি শিশুর ৩ বছর বয়স পর্যন্ত বছরে ৮-১০ বার হতে পারে। প্রতিরোধের উপায় সেভাবে কিছু নেই। ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা নিলে (যা প্রতি বছর একবার করে নিতে হয়) কিছুটা সংক্রমণের হার কমে।

এর সঙ্গে বাচ্চা যদি অ্যালার্জি-প্রবণও হয় তবে দুইয়ে মিলে বাচ্চার ঠান্ডা লাগার হার অনেকটাই বেড়ে যায়। সেটা প্রায় প্রতিমাসে বা কখনো মাসে একবারের বেশিও হয়ে দাড়ায়।

এই ক্ষেত্রে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে যেসব বস্তু (অ্যালার্জেন) সেগুলো যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। খাবারের 'অ্যালার্জেন' সেভাবে দায়ী না থাকলেও অনেক সময় খুব শিশু বয়স থেকে গোরুর দুধ খাওয়ালে বা খাবারের কৃত্রিম রং থেকে অ্যালার্জি হতেও পারে। সাধারণভাবে যেসব বাতাসে ভেসে আসা 'অ্যালার্জেন'গুলো দায়ী তারা হল—

যেকোনোরকম ধোঁয়া, বিশেষ করে বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া, মশা তাড়ানোর কয়েল বা ধূপের ধোঁয়া, রান্নার ধোঁয়া, ধুলো, বিশেষ করে বালিশ, বিছানা, পাপোশের সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও তার সঙ্গে মিশে থাকা অতি ক্ষুদ্র এক ধরনের পোকা (Dust Mites)।

- আরশোলার বর্জ্য পদার্থ।
- পোষা জীবজন্তুর লোম।
- কিছু ক্ষেত্রে গন্ধদ্রব্য যথা পারফিউম, রুম ফ্রেশনার ইত্যাদি।
- বাড়িতে লাগানো ফুলগাছ বা বাড়ির আশেপাশের কিছু আগাছা ফুলের পরাগরেণু ইত্যাদি।

এই সমস্ত জিনিস থেকে বাচ্চাকে যতটা সম্ভব দূরে রাখতে হবে। এতেও কাজ না হলে প্রতিরোধক হিসাবে নাকে দেবার স্টেরয়েড বা কিছু ওষুধ (যথা Montelukast) ব্যবহার করতে হবে এবং তা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।

অ্যালার্জিক সর্দির সঙ্গে শ্বাসনালীর অতিসক্রিয়তা রোগ (hyperactive airway disease) থাকলে শিশুকে নিয়মিত ডাক্তারের চিকিৎসায় রাখা ভালো। Hyperactive Airway কথাটির অর্থ হল শ্বাসনালীর অতিসক্রিয়তা—অর্থাৎ অ্যালার্জির কারণে শ্বাসনালীগুলো হঠাৎ করে সরু হয়ে যায়। রোগটি অনেকটা অ্যাজমার মতো তবে মোটেও অ্যাজমা নয়। সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশির ভাগ বাচ্চাই রোগটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়।

সবশেষে মনে রাখতে হবে আজকাল বায়ুদূষণের জন্য এইসব রোগ অত্যন্ত দ্রুতহারে শহরাঞ্চলে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই রোগটি সম্বন্ধে নিজেরা অবহিত থাকলে প্রয়োজনীয় সাবধানতাগুলো মেনে চলতে পারবেন।

৪. রাত্রে শোয়ালে বাচ্চা ঘড়ঘড় করে শ্বাস নেয় ও সঙ্গে সামান্য কাশি থাকে—এর মানে কি বুকে কফ বসা?

এটা বোধহয় অধিকাংশ বাবা-মায়ের ভ্রান্ত ধারণাগুলোর একটা। এই ঘড়ঘড় শব্দের কারণ হল 'Post nasal drip'। অর্থাৎ শিশুর নাকে বা গলায় অতিরিক্ত শ্লেষ্মা তৈরি হয়ে তা নাকের পিছন দিকে গড়িয়ে গলায় জমা হয়। ঘুমিয়ে থাকার কারণে বাচ্চা তা গিলে ফেলে না ও গলায় সেই শ্লেষ্মা জমতে থাকে। এর মধ্যে দিয়ে হাওয়া চলাচল করলে ওই ঘড়ঘড় শব্দ হয়। এই একই কারণে বাচ্চা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাশতেও থাকে।

বুকে ঘড়ঘড় শব্দের সঙ্গে যদি অতিরিক্ত জ্বর থাকে এবং বাচ্চার শ্বাসকষ্টও হয়, সেক্ষেত্রে অবশ্য তা নিউমোনিয়া বা বুকের সংক্রমণ হতে পারে। অতিরিক্ত জ্বর বা শ্বাসকষ্ট ছাড়া ঘড়ঘড় শব্দের সঙ্গে শ্বাস নেওয়া কিন্তু বুকে সর্দি বসা নয়।

৫. নাক থেকে মোটা হলুদ সর্দি কতটা দুশ্চিন্তার?

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কমন কোল্ড-এর শেষ দিকে বা অ্যালার্জিক সর্দির কোনো কোনো সময় শ্লেষ্মা শুষ্ক হয়ে অতিরিক্ত গাঢ় হয় ও হলুদ হয়। এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাকের ভিতর

ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণের কারণে সাইনুসাইটিস হলে এরকম হলুদ সর্দি হতে পারে। সেক্ষেত্রে সঙ্গে সাধারণত জ্বর থাকবে, নাকে দুর্গন্ধ থাকবে ও নাকের চারপাশে টিপলে ব্যথা থাকবে। মাথা সামনের দিকে ঝোঁকালে সাধারণত এই ব্যথা বেড়ে যায়।

৬. মলের সঙ্গে কফ পাতলা করে বের করে দেওয়া কতটা যৌক্তিক?

এটা নিতান্তই মনগড়া ভুল ধারণা। আমাদের শ্বাসনালীটি গলার পর থেকে ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে অনেক শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। সেখানে তৈরি হওয়া শ্লেষ্মাকে তুলে গলায় এনে ফেলার মতো কোনো কার্যকরী ওষুধ ডাক্তারি শাস্ত্রে নেই। আর চিকিৎসার জন্য এরকম অদ্ভুত কিছুর প্রয়োজনও হয় না।

মলের সঙ্গে কফের মতো যে শ্লেষ্মা বা আম দেখা যায় তা মলের সঙ্গেই তৈরি হয়। বুকের গিলে ফেলা কফ নয়।

৭. তাহলে বুকে কফ জমা আদতে কী?

বয়স্ক মানুষদের সর্বক্ষণের বুকে কফ জমে থাকার মতো দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসপথ বন্ধ হবার অসুখ (COPD) বা দীর্ঘমেয়াদি ব্রংকাইটিস (Chronic Bronchitis) শিশুদের হয় না। আরেকটা রোগ আছে, ব্রঙ্কিএকটোসিস (Bronchiectasis)। তাতে শ্বাসনালীর গঠন নষ্ট হয়ে যায়—এ রোগও শিশুদের অতি বিরল, তাই আপাতভাবে বলতে গেলে শিশুদের বুকে কফ জমার মতো একমাত্র রোগ হল নিউমোনিয়া। সেক্ষেত্রে অবশ্যই শিশুকে অসুস্থ লাগবে, বেশি জ্বর আসবে এবং সঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকবে। নিউমোনিয়াতেও শিশু কাশবে ও কফ বেরোবে, কিন্তু নিউমোনিয়ার কফ ঠিক সাধারণ শ্লেষ্মা নয়। এ ছাড়া ‘ব্রঙ্কিওলাইটিস (Bronchiolitis) নামে একটি রোগেও বাচ্চার সাধারণ জ্বর ও নাক থেকে জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসনালীরও ভাইরাস সংক্রমণ হয়। এক্ষেত্রেও বাচ্চার শ্বাসকষ্ট থাকবে।

সুতরাং বাচ্চার বুকে যদি সত্যিই গুরুতর কিছু থাকে—তার শ্বাসকষ্ট হবে। সাধারণ সর্দিকাশিতে বুকে কফ জমা বলে কিছু হয় না। আর সর্বোপরি বুকে কফ শুকিয়ে বসে গেছে বলে কোনো রোগের বিজ্ঞানসম্মত অস্তিত্ব আপনার না জানলেও চলবে।[১] **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

সূত্র নির্দেশ :

১. ইচ্ছে থাকলে ইন্টারনেটে ‘সিস্টিক ফাইব্রোসিস’ (cystic fibrosis) নিয়ে পড়তে পারেন—কিন্তু সেটা হয়েছে কিনা, সেকথা একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারই কেবল বলতে পারেন—তাও বিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা করে তবেই।

ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে, এমবিবিএস, শিশুরোগ (পিডিয়াট্রিক মেডিসিন) বিষয়ে এমডি করছেন।

Advt.

প্রাথমিক চিকিৎসা, বিষক্রিয়া ও আহতের যত্ন

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

ফাউন্ডেশন ফর হেলথ অ্যাকশন

Advt.

রোগ নির্ণয়, রোগীর সেবাযত্ন ও ওষুধ নিয়ে কিছু তথ্য

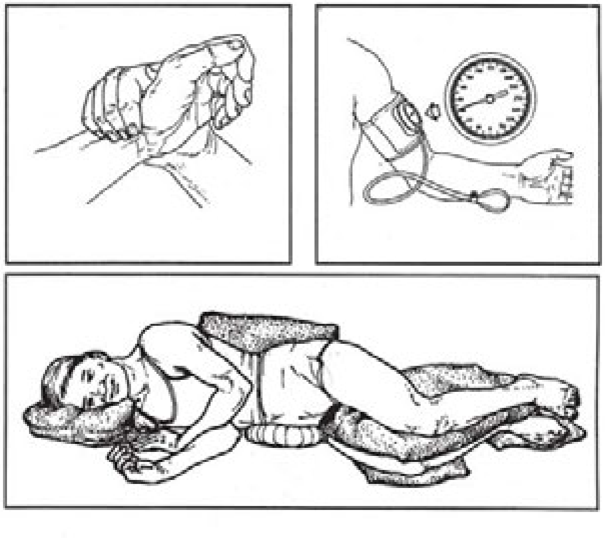

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

হাঁপানি

হাঁপানি রোগটা নিয়ে আমাদের সমাজে কুসংস্কারের শেষ নেই। তার ওপর এই রোগ এ-দেশে দিনে দিনে বাড়ছে। বাচ্চাদের হাঁপানিতে কষ্ট চোখে দেখাও যেন অসহনীয় অভিজ্ঞতা। কিন্তু এখন হাঁপানির চিকিৎসার মূল কথা জেনে রাখলে, তেমন ভয়ের কিছু নেই—লিখছেন **ডা. কুশল সেন**।

চিত্র ১. হাঁপানি রোগী ইনহেলার নিচ্ছেন

হাঁপানি কী?

হাঁপানি হল শ্বাসনালীর একধরনের দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহজনিত রোগ যেখানে শ্বাসনালীর মধ্যে দিয়ে বায়ু চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। আরও সহজভাবে বলতে গেলে হাঁপানি রোগ শ্বাসনালীর এক ধরনের অ্যালার্জি যেটা বেশিরভাগ সময় বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, কাশি, (প্রধানত রাতে বা ভোরের দিকে), শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ ভাব ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে দেখা দেয়।

কীভাবে হয় এই রোগ?

হাঁপানি রোগে শ্বাসনালীর সংবেদনশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা নানা কারণে বৃদ্ধি পায়। তখন শ্বাসনালীর বিভিন্ন অংশে দেওয়ালে মাংসপেশি সংকুচিত হয়ে যায় এবং শ্বাসনালীর অভ্যন্তরে শ্লেষ্মা (mucous) ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। ফলে শ্বাসনালীর ভেতরে বায়ু চলাচলের রাস্তা কমে যায়, আর এই বায়ু চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার রোগটাকেই আমরা হাঁপানি বা অ্যাজমা বলি।

যাদের হাঁপানি রোগ দেখা দেয় তাদের শ্বাসনালী কিছু বিশেষ বিশেষ কারণে, বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। ফলে শ্বাসনালীর একেবারে সরু সরু শাখাগুলোর (ক্লোমশাখা, উপক্লোমশাখা) মধ্যে দিয়ে বায়ু চলাচল ব্যাহত হয়। এই বিশেষ কারণ বা ক্ষেত্রগুলো, যাদের উপস্থিতির জন্য শ্বাসনালীর শাখাগুলো সরু হয়ে যায়, তাদের এককথায় হাঁপানি রোগের ট্রিগার বলে। ওই একই ট্রিগার উপস্থিত থাকলেও, যাদের হাঁপানি রোগ নেই তাঁদের কিছুই হয় না।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাঁপানি রোগীদের অন্যান্য ধরনের অ্যালার্জির রোগ থাকে। যেসব ট্রিগার (যেমন ধুলো, ফুলের রেণুর সংস্পর্শ, কোনো বিশেষ খাবার, কোনো ওষুধ ইত্যাদি) অ্যালার্জির কারণ হতে পারে, তাদের সংস্পর্শে রোগীর অন্য কোনো ধরনের অ্যালার্জির রোগ, যেমন অ্যালার্জি-জনিত হাঁচি ইত্যাদি হয়; এবং সেই বিশেষ ট্রিগার বা অন্য কোনো ট্রিগার-এর সংস্পর্শে রোগীর হাঁপানি দেখা দেয়।

যাদের অ্যালার্জির প্রবণতা থাকে তাদের শরীরে IgE গোত্রের অ্যান্টিবডি বেশি তৈরি হয়। এই IgE অ্যান্টিবডি অ্যালার্জির বিভিন্ন উপসর্গের জন্য দায়ী। IgE অ্যান্টিবডি শ্বাসনালীকে অতিসংবেদনশীল করে দেয়। ট্রিগারের উপস্থিতিতে হাঁপানি রোগীদের শরীরে এই IgE অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, ফলে শ্বাসনালীর সংকোচন এবং তার মধ্যে শ্লেষ্মা ক্ষরণ বেড়ে গিয়ে বায়ু চলাচল ব্যাহত হয়। এ ছাড়া অনেক সময় শ্বাসনালীতে ভাইরাস সংক্রমণের ফলেও এই রোগ দেখা যেতে পারে।

এই ট্রিগারগুলো কী কী?

১. অ্যালার্জেন: যেসব জিনিস অ্যালার্জি করে তাদের অ্যালার্জেন বলে। যেমন: ধুলো, রেণু, জীবাণু, গবাদি পশুর লোম, পাটের তন্তু ইত্যাদি। নিশ্বাসের সঙ্গে এই অ্যালার্জেন হাঁপানি রোগীর শ্বাসতন্ত্রে প্রবেশ করলে IgE অ্যান্টিবডি ক্ষরিত হয়ে শ্বাসনালীর সংকোচন ঘটায়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্বাসনালীতে ইডিমা (কোষকলায় জল জমে ফুলে যাওয়া) ও প্রদাহ হয়, ফলে শ্বাসনালী সংকুচিত হয় ও বায়ু চলাচল বাধা পায়।

২. ভাইরাস সংক্রমণ: শ্বাসনালীতে ভাইরাস সংক্রমণের ফলেও হাঁপানি রোগীদের রোগের হঠাৎ আক্রমণ দেখা যেতে পারে।

৩. ওষুধ: বিভিন্ন ওষুধ হাঁপানি রোগকে বাড়াতে সাহায্য করে। যেমন: বিটা ব্লকার (যথা অ্যাটেনলল), অ্যাঞ্জিয়োটেনশিন কনভার্টিং উৎসেচক প্রতিহতক (যেমন এনালাপ্রিল)। অন্যান্য স্টেরয়েড-নয়-এমন প্রদাহ বিনাশকারী ওষুধ (যথা অ্যাস্পিরিন) কখনো কখনো হাঁপানি রোগকে বাড়িয়ে দেয়।

৪. ব্যায়াম: ব্যায়াম করা বা খেলাধুলা করা হাঁপানি রোগের অন্যতম ট্রিগার। ব্যায়ামজনিত হাঁপানি সাধারণভাবে ব্যায়াম বা খেলাধুলার পর শুরু হয় এবং সাধারণভাবে ব্যায়াম শেষ হওয়ার ৩০ মিনিটের মধ্যে নিজে নিজেই কমে যায়।

৫. বায়ু দূষণ: বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড, ওজোন, নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদির পরিমাণ বেশি থাকলে হাঁপানি রোগীদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে পারে।

৬. কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত হাঁপানি (Occupational Asthma): বিভিন্ন শিল্পে

ব্যবহৃত হওয়া প্রচুর জিনিসপত্র (আইসোসায়ানেটস, আটা বা গমের ধুলো, ল্যাটেক্স, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি) হাঁপানি রোগের ট্রিগার হিসাবে কাজ করে। এই ক্ষেত্রে রোগীদের কাজ করার সময় উপসর্গ দেখা যায় যা ছুটির দিনগুলোতে দেখা যায় না। অবশ্য দীর্ঘদিন ধরে এই ট্রিগারের সংস্পর্শে থাকলে উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ছুটির দিনগুলোতেও কষ্ট উপশম হয় না।

কাদের কাদের এই হাঁপানি রোগ হতে পারে?

হাঁপানি রোগের সব কারণ এখনও অজানা। তবু কিছু কিছু কারণ বা পরিস্থিতি বর্তমান থাকলে এই রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

১. যাদের পরিবারে হাঁপানি বা অন্যান্য অ্যালার্জি রোগ আছে।

২. অল্প বয়স থেকে ধূমপান করা বা সিগারেটের ধোঁয়ার সংস্পর্শে থাকা, অথবা মা যদি গর্ভাবস্থায় ধূমপান করেন।

৩. সময়ের আগে জন্মানো শিশু (premature baby) যাদের জন্মের পর কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

৪. যদি ব্রঙ্কোলাইটিস নামক ফুসফুসের রোগ থেকে থাকে।

৫. কম ওজনের শিশু (মাতৃগর্ভে ঠিকমতো বৃদ্ধি না হওয়ার ফলে)

উপরিউক্ত পরিস্থিতিগুলোতে হাঁপানি রোগের আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে থাকে।

কী হয় এই হাঁপানি রোগে? (উপসর্গ)

হাঁপানি রোগের মূল উপসর্গগুলি হল:

ক. কাশি

খ. শ্বাসকষ্ট

গ. বুকে সাঁই সাঁই শব্দ।

এই উপসর্গগুলোর তীব্রতা চিকিৎসার ফলে কিংবা কখনো বা নিজে থেকেই বাড়ে কমে। রাতের দিকে অথবা খুব ভোরের দিকে এই উপসর্গগুলো বেশি দেখা যায়। কখনো কখনো হাঁপানি রোগাক্রান্ত ছোটো বাচ্চারা কেবল শুকনো কাশি নিয়েও ডাক্তারখানায় আসতে পারে। ওষুধ দিয়ে বা চিকিৎসার পর রোগ নিয়ন্ত্রণে এলে রোগের কোনো লক্ষণই উপস্থিত থাকে না।

হাঁপানি রোগের হঠাৎ আক্রমণ (Asthma Attack) থেকে সাবধান:

যখন হাঁপানি রোগের লক্ষণগুলো হঠাৎ করে তীব্র হয়ে পড়ে তখন তাকে ডাক্তারি পরিভাষায় Asthma Attack বা Acute Asthma Exacerbation বলে। এটা একটা জীবনহানিকর পরিস্থিতি। সাধারণত হাঁপানি রোগের চিকিৎসা না করালে বা হাঁপানি রোগ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে না রাখলে এই Asthma Attack হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে শ্বাসকষ্ট প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়, রোগীর বুকে চাপ ভাব অসহ্য হয়ে পড়ে। এমনকী রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যে ওষুধে আগে রোগীর কষ্ট লাঘব হত সেই ওষুধ কাজ করে না।

হঠাৎ করে এই পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে, আবার কখনো বা দু-তিন দিন ধরে উপসর্গগুলো অল্প অল্প করে বাড়তে বাড়তে এই পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে।

এই অবস্থায় রোগীকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

চিত্র ২. স্পেসারসহ ইনহেলার

রোগ নির্ণয়

সাধারণত রোগের লক্ষণ, রোগের বিস্তার, বছরের বিভিন্ন সময়ে রোগের তীব্রতা বাড়া কমা থেকে ডাক্তার রোগ নির্ণয় করতে পারেন। শিশুদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রোগের লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না, কারণ শিশুদের ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ একই রকম লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ পায়। ফলে রোগ নির্ণয় সুনিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি করা বাঞ্ছনীয়।

ক. স্পাইরোমেট্রি: এটা এক ধরনের শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্ষমতার পরীক্ষা যেটা ফুসফুসের কার্যক্ষমতার পরিমাপ করে। স্পাইরোমিটার নামক একটি যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত মাউথপিস-এ রোগীকে জোরে ফুঁ দিতে বলা হয়। এই যন্ত্রে দু-টি জিনিস পরিমাপ করা হয়, এক, প্রথম সেকেন্ডে কত আয়তনের বাতাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরোয়, দুই, মোট কত আয়তনের বাতাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বার করে। তারপর এই পরিমাপকে রোগীর লিঙ্গ ও বয়সের অনুপাতে তুলনা করে দেখা হয়। অনেক সময় এরপর শ্বাসনালী প্রসারক কোনো ওষুধ রোগীকে দেওয়া হয় আর তারপর আবার পরীক্ষা করে দেখা হয় ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কতটা বৃদ্ধি পেল।

খ. পিক্ এক্সপিরেটরি ফ্লো টেস্ট: পিক ফ্লো মিটার নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে ফুঁ দিয়ে দেখা হয় যে সে কত জোরে ফুঁ দিতে পারে। এটা ফুসফুসের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এই পরীক্ষা করতে গেলে অভ্যাসের প্রয়োজন, তাই দুই-তিন বার করে সব থেকে ভালো ফলটা নেওয়া হয়। যখন এই পরীক্ষাগুলো থেকে রোগ নির্ণয় সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয় না তখন আরও কয়েকটা পরীক্ষা থেকে রোগ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যেতে পারে।

গ. শ্বাসতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীলতা: যখন উপরের আলোচিত পরীক্ষাগুলো থেকে হাঁপানি রোগের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে বলা যায় না তখন হাঁপানির সম্ভাব্য 'ট্রিগার'-এর (যথা ধুলো, রেণু, ওষুধ) সংস্পর্শে রোগীকে আনা হয়, তারপর স্পাইরোমিটার যন্ত্রে রোগীর ফুসফুসের কার্যক্ষমতা দেখা হয়। যাদের হাঁপানি রোগ নেই তাদের ফুসফুসের কার্যক্ষমতার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। কিন্তু হাঁপানি রোগীদের এই ট্রিগারগুলির সংস্পর্শে এলেই হাঁপানি রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় এবং ফুসফুসের কার্যক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়।

ঘ. শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহের পরিমাপ: দু-ভাবে এই পরিমাপ করা যেতে পারে— ১. শ্বাসযন্ত্রের থেকে শ্লেষ্মা সংগ্রহ করে; ২. প্রশ্বাসের মধ্যে নাইট্রিক অক্সাইডের উপস্থিতি থেকে।

৬. অ্যালার্জির উপস্থিতি: চামড়া অথবা রক্তের পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরে অন্যান্য অ্যালার্জির উপস্থিতি শরীরে হাঁপানি রোগ থাকার সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

চিকিৎসা

চিকিৎসার দ্বারা হাঁপানি রোগ সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় না। কিন্তু এমন অনেক চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে যা দিয়ে এই রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এই চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হল ১. রোগের লক্ষণগুলিকে উপশম করা; ২. ভবিষ্যতে যাতে এই লক্ষণগুলি প্রকাশ না পায় তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া।

চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া ওষুধ ব্যবহার করা ছাড়াও হাঁপানি রোগের ট্রিগারগুলি থেকে রোগীকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। হাঁপানি রোগের হঠাৎ আক্রমণের লক্ষণগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থেকে আপৎকালীন অবস্থার জন্য তৈরি থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সবসময় নিজের কাছাকাছি রাখতে হবে।

ইনহেলারস বা শ্বাসযন্ত্রে সরাসরি টেনে নেবার ওষুধ:

আজকাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাঁপানি রোগের ওষুধ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে এই ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

১. মিটার ডোজ ইনহেলারস: এই যন্ত্রে প্রতিবার চাপ দিলে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ওষুধ যন্ত্র থেকে বের হয়। কিন্তু এই যন্ত্র ব্যবহার করতে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যবহার করতে হবে, এবং ঠিকমতো ব্যবহার করা জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন।

২. রোটাহেলার: এই যন্ত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট মাত্রার ওষুধযুক্ত ক্যাপসুল ভরে যন্ত্রটাকে ঘোরালে ক্যাপসুলটা ভেঙে গিয়ে মধ্যেকার গুঁড়ো ওষুধ যন্ত্রের মধ্যে চলে যায়। তারপর যন্ত্রটা মুখে লাগিয়ে জোরে টানলে ওষুধ শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করে। এটা ব্যবহার করার জন্য সেরকম বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না।

তবে বয়স্ক এবং বাচ্চাদের শ্বাসতন্ত্রের সহকারী মাংসপেশির জোর কম থাকায় রোটাহেলার ব্যবহারে সমস্যা হয়, আবার তাদের পক্ষে মিটার ডোজ ইনহেলারস দিয়ে ওষুধ নেওয়াও শক্ত। তাই তাদের জন্য স্পেসার নামক একটি যন্ত্র মিটার ডোজ ইনহেলারের সঙ্গে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। স্পেসার হল একটি মাকু আকৃতির ফাঁপা চোং যার একদিকের মুখে মিটার ডোজ ইনহেলার লাগানো হয় আর অন্যদিকের মুখটা রোগী নিজের মুখের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়ে দেন। মিটার ডোজ ইনহেলার দিয়ে রোগীর প্রয়োজনীয় মাত্রার ওষুধ স্পেসারের একদিকের মুখ দিয়ে স্পেসারের ভেতরে দেওয়া হয়, এবং রোগী স্পেসারের অন্য মুখটা নিজের মুখে রেখে শ্বাসপ্রশ্বাস নেন। মিটার ডোজ ইনহেলারটি একবারে যতটা ওষুধ স্পেসার-এ ঢুকিয়ে দেয়, রোগী স্পেসার থেকে আস্তে আস্তে সেই পুরো ওষুধটাই মুখ দিয়ে টেনে নিতে পারেন।

চিত্র ৩. মিটার ডোজ ইনহেলার

যে সব ওষুধ হাঁপানি রোগে ব্যবহৃত হয়

১. শ্বাসনালী প্রসারক:

স্বতন্ত্র স্নায়ুর (autonomic nervous system) উপর কাজ করে:

- বিটা রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট যেমন: স্যালবুটামল, টারবুটালিন (এরা ক্ষণস্থায়ী), স্যালমেটেরল, ফরমেটেরল (এরা দীর্ঘস্থায়ী) ইত্যাদি।
- অ্যান্টিকোলিনার্জিক: ইপ্রাটোপিয়াম ব্রোমাইড, টাইট্রোপিয়াম ব্রোমাইড ইত্যাদি।
- মিথাইল জ্যান্থিন: থিওফাইলিন, অ্যামিনোফাইলিন, ইটোফাইলিন ইত্যাদি।

২. লিউকোট্রাইন রিসেপটর অ্যান্টাগনিস্ট: মন্টেলুকাস্ট, যাফিরলুকাস্ট ইত্যাদি।

৩. স্টেরয়েড: বেক্লোমিথাজোন, ফ্লুটিকাজোন, বুডেসোনাইড (এগুলো ইনহেলারের মাধ্যমে নিতে হয়), এ ছাড়া প্রেডনিসোলন, হাইড্রোকরটিসোন (মুখে খাওয়ার ওষুধ বা ইঞ্জেকশন) ইত্যাদি।

এ ছাড়াও সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট, কিটোটিফেন (মাস্ট কোষ স্টেবিলাইজার), ওমালিযুমাব ইত্যাদিও কদাচিৎ হাঁপানি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ওষুধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় এখানে যাব না, চিকিৎসক দরকার মতো ওষুধ দেবেন। খেয়াল রাখবেন, নিয়মিত ওষুধ যেন চালানো হয়। অনেক সময়ের হাঁপানির রোগলক্ষণ অদৃশ্য হয়ে গেলে ওষুধও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটা ঠিক নয়। কিছু কিছু ওষুধ আছে যেগুলো রোগলক্ষণ থাকলে তবেই ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু বাকি ওষুধগুলো রোগলক্ষণ না থাকলেও চালাতে হবে, নইলে দ্রুত হাঁপানি তার সমস্ত লক্ষণ নিয়ে হাজির হবে, রোগী কষ্ট পাবেন। সুতরাং কোন ওষুধ কতদিন চালাবেন, কখন বন্ধ করবেন, সে ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলুন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কুশল সেন, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে ওঠা একটি ক্লিনিকের আংশিক সময়ের চিকিৎসক।

স্মরণে

ডা. সুব্রত মৈত্র

(৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬-১৭ মার্চ, ২০১৬)

কলকাতার মেডিসিন-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে নিজগুণে নিজের স্থানটি অর্জন করেছিলেন ডা. সুব্রত মৈত্র, তবে সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল না। একদিকে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার জন্য ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক উদ্যোগ, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংকটমোচন ও তার সমূহ উন্নতি সাধনে আন্তরিক প্রচেষ্টা, এই দুটো কাজ তাঁকে আর পাঁচজন 'বড়ো' ডাক্তারের চাইতে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। মাত্র ঊনষাট বছর বয়সে প্রয়াত হলেন সেই ডাক্তার সুব্রত মৈত্র। ডা. মৈত্র মারা যান মস্তিষ্কের টিউমারে। তিনি তাঁর রোগের ভয়াবহতা খুব ভালোই বুঝতেন। এই রাজ্যের এক প্রাইভেট হাসপাতালের সঙ্গে তিনি নিজে যুক্ত ছিলেন চিকিৎসক হিসেবে, আর সেখানেই তিনি নিজের চিকিৎসা করান। শেষদিন পর্যন্ত তিনি নিজের আসন্ন মৃত্যুকে প্রায় উপেক্ষা করেই চিকিৎসা ও পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, আর তার রূপায়ণে চেষ্টা করেছেন।

কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে তিনি প্রথমে ডিএনবি করেন, তারপর ইংল্যান্ডে গিয়ে করেন এমআরসিপি। সেখানে বছর আটেক 'ক্রিটিক্যাল কেয়ার'-এ কাজ করে দেশে ফিরে যোগ দেন উডল্যান্ড হাসপাতালে। ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশালিটিতে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। নানা সেলিব্রিটি রোগী তাঁর কাছে চিকিৎসিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর বৃহত্তর অবদান কোনটি, সে প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, ডাক্তারি করা ছাড়াও স্বাস্থ্যব্যবস্থা পরিকল্পনা ও হাতেকলমে গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যসমস্যা নিয়ে কাজ করা—এর জন্য ভাবীকাল তাঁকে বহুদিন মনে রাখবে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে, সেবামূলক এক সংগঠনের সহায়তায় ও নিজস্ব সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় সুন্দরবন অঞ্চলে তিনি 'রঙ্গনাথানন্দ গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র' গড়ে তুলেছিলেন। নানা প্রত্যন্ত অঞ্চলে মেডিক্যাল ক্যাম্পে তাঁকে বহুবার দেখা গেছে। তবে তাঁর সবথেকে পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্যে পদক্ষেপ হল তৃণমূল সরকারের আমলে গড়ে ওঠা চিকিৎসাক্ষেত্রের উন্নতিকল্পে বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর কাজ। রাজ্য সরকারের 'বঙ্গভূষণ' খেতাব পাওয়া এই ডাক্তারবাবুকে চালু রাজনীতির কোনো নির্দিষ্ট ছকে ফেলে দেখা শক্ত ব্যাপার। ব্যক্তি হিসেবে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে, তারপর এটুকু বলাই যায়, তাঁর নীতির সঙ্গে কারও মিলতে পারে বা নাও মিলতে পারে, কিন্তু মানুষের জন্য তাঁর প্রচেষ্টায় খাদ ছিল না।

নানা জায়গায় সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি, জেলার নানা হাসপাতালে আইসিসিসিইউ, হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট, ডায়ালিসিস ইউনিট ইত্যাদি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন ডা. সুব্রত মৈত্রর নেতৃত্বাধীন সরকারি কমিটি। কলকাতা-কেন্দ্রিক, নগর-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য-উন্নয়নের পরিচিত ছক থেকে কিছুটা হলেও বেরিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছিল, গ্রামে-মফস্বলে সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল-হকিকত ঠান্ডা ঘরের বাইরে বেরিয়ে সরেজমিনে দেখার চেষ্টা হয়েছিল। আর সেই প্রচেষ্টার অন্যতম মুখ ছিলেন ডা. মৈত্র।

তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন এমন চিকিৎসকদের মত হল, ডা. মৈত্রের সবথেকে বড়ো দিক ছিল বাংলার মানুষের জন্য অসীম ভালোবাসা। আর তাই তিনি 'কর্পোরেট ডাক্তার' হয়েও সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন নিঃস্বার্থভাবেই। নেতৃত্ব দেবার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর, নিজের অধীনস্থ ডাক্তার ও কর্মীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার ও উৎসাহদানের মাধ্যমেই চিকিৎসা ক্ষেত্র থেকে স্বাস্থ্যনীতি পরিকল্পনা, উভয় জায়গাতেই তিনি নেতা হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর কথা শুনতেই হবে, এমন কোনো চাপিয়ে দেওয়া জোরজুলুমে তাঁর আস্থা ছিল না।

তাঁর পরিকল্পনা শতকরা একশো ভাগ ঠিক ছিল, তা নিশ্চয়ই নয়, কোন পরিকল্পনাই বা পুরো ঠিক হয়? সেই পরিকল্পনার রূপায়ণেও খামতি ও গাফিলতি ছিল নানা স্তরে, তাই কাজ কিছুটা হয়েছে, অনেকটা হয়নি; যতটা হয়েছে তার মধ্যে অনেক ভ্রান্তি রয়ে গেছে।

ডা. মৈত্রকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে তাঁর সেই পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ-প্রচেষ্টা একবার দেখতেই হয়।

১. জেলা ও সাব-ডিভিশন স্তরের হাসপাতালে উচ্চমানের নিবিড় চিকিৎসা ইউনিট (সিসিইউ ও হাই ডিপেন্ডান্সি ইউনিট) তৈরির পরিকল্পনা করা, যার ২২টি চালু হয়েছে। এর সঙ্গে যথাযোগ্য প্যাথো ল্যাবের ব্যাক-আপ-এর ব্যবস্থার পরিকল্পনা।

২. জেলা ও সাব-ডিভিশন স্তরে ২ থেকে ৪ শয্যার ডায়ালিসিস ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা করা, যার মধ্যে ৮টি চালু হয়েছে।

৩. জেলা ও সাব-ডিভিশন স্তরে যথাযথ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দিয়ে ৪ থেকে ৮ শয্যার ইমার্জেন্সি অবজার্ভেশন ওয়ার্ড তৈরির পরিকল্পনা করা।

৪. ৬টি জেলা হাসপাতালে ডিএনবি কোর্স চালু করা হয়েছে, আরও ১২টি জেলা হাসপাতালে এই কোর্স চালু হবার কথা।

৫. রাজ্যস্তরে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা, যাতে প্রশিক্ষিত ডাক্তার পাবার সমস্যা মেটে।

৬. ১৮ রকমের প্যারামেডিক্যাল কোর্সের জন্য প্যারামেডিক্যাল কাউন্সিল গঠন।

৭. সরকারি হাসপাতালে আরএসবিওয়াই স্কিমের রোগীকে চিকিৎসা করার উদ্যোগ। এই বিমা থেকে পাওয়া টাকা রোগী কল্যাণ সমিতিতে জমা দেওয়া।

৮. জেলা ও সাব-ডিভিশন স্তরের হাসপাতালে প্যাথোলজির কাজের জন্য সেমি-অটোঅ্যানালাইজার মেশিনের ব্যবস্থা।

৯. ওয়ার্ড-মাস্টারের পুরোনো পোস্টের জায়গায় বেশি দায়িত্বসম্পন্ন অ্যাসিস্টেন্ট সুপার-এর পদ তৈরি।

১০. ডিগ্রিহীন গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের প্রচেষ্টায় ব্যবস্থা।

১১. ক্যানিং হাসপাতালে সাপে কাটা রোগীর রেফারেল সেন্টার তৈরি, ও সেখানে ডায়ালিসিস ও ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা।

১২. কৃষ্ণনগরে আর্সেনিক চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি।

১৩. সারা রাজ্য জুড়ে নতুন এইসব সুবিধাগুলোর দেখভাল করার টিম গঠন।

১৪. এসএসকেএম ও অন্যান্য হাসপাতালে ডাক্তার ও অন্যান্য স্টাফের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

তিনি নিজে ও তাঁর টিম, দার্জিলিং থেকে সাগর জুড়ে এই রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ১১৪টি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেছিলেন ৪ বছর সময়ে। অনেক কেন্দ্রে একাধিক বার গিয়েছিলেন তাঁরা। আর জেলাস্তরে ৩-৪ মাস অন্তর পরিদর্শনের বন্দোবস্ত করেছিলেন।

তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু পরিকাঠামোর যে উন্নতির প্রয়োজন ছিল, সেটা হয়েছে কিনা, তা নিয়ে ডা. মৈত্রর অনেক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর মনেও সন্দেহ আছে। এঁদেরই একজন লিখেছেন, ‘‘আগের জমানার মতোই মেডিক্যাল কাউন্সিল বা আইএমএ বর্তমান শাসক শক্তির করায়ত্ত। . . . যে বিশাল বিশাল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালগুলি গড়ে তোলা হচ্ছে তাতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কোথা থেকে পাওয়া যাবে তা ঘোর অনিশ্চিত। জেলা বা মহকুমা হাসপাতালগুলিতেই বিশেষজ্ঞের অভাব। বহুক্ষেত্রেই CCU বা SNCU চালাতে গিয়ে টান পড়ছে সাধারণ ওয়ার্ডে বা জরুরি বিভাগে। . . . স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার নিশ্চয়ই কিছু ভালো কাজ করেছেন। বহুক্ষেত্রে সদিচ্ছাও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ।’’

ডা. সুব্রত মৈত্রের অকাল-প্রয়াণ সেই ‘সঠিক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ’-এর কাজটিকে আরও বাধাগ্রস্ত করল, এইটুকু বলেই আমরা তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

টুকরো খবর

নিরামিষ খাদ্য ভালো, কিন্তু সুষম খাদ্যই স্বাস্থ্যকর

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাডা কয়েকদিন আগেই বলেছেন, নিরামিষ খাবার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। কিন্তু *টাইমস অফ ইন্ডিয়া* বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে প্রশ্ন করে যা জেনেছেন তার সঙ্গে মন্ত্রীর বক্তব্য মেলে না।

সব চিকিৎসকই বলেছেন যে নানা শাকসবজি, ফল ও দানাশস্য শরীরের পক্ষে ভালো ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু অনেক চিকিৎসকের বক্তব্য, আমিষ-জাতীয় খাবার একেবারে না খেলে শরীর নানা অত্যাবশ্যক খাদ্য-উপাদান থেকে বঞ্চিত হবে; যেমন ভিটামিন বি ১২, ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এগুলো নিরামিষ খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না, আর মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও পেশির গঠনে এদের ভূমিকা আছে।

ভারতে ও অন্য দেশে সমীক্ষা করে দেখা গেছে, স্থূলতা, হৃদ্‌রোগ ও ক্যানসারের হার নিরামিষাশীদের মধ্যে কম। একজন বিশিষ্ট হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞর মতে মাংসভুকদের তুলনায় নিরামিষাশীদের হৃদ্‌রোগের হার ২০ শতাংশ কম। তাঁর মতে, ‘শাকসবজি ও ফলে যে তন্তু থাকে তা কোলেস্টেরল কমায়, আর স্থূলতা আটকায়। এতে হৃদ্‌যন্ত্র ভালো থাকে।’ কিন্তু এর বিপরীত মতও চিকিৎসক মহলে রয়েছে। নিরামিষ আহারে ভালো দিক নিয়ে প্রশ্ন তাঁরা ততটা করছেন না, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে যে ‘বিকৃত নিরামিষ আহার’ চালু আছে, সেটাকে ভালো বলতে রাজি নন অনেকেই।

এক বিশিষ্ট ডায়াবেটিস ও তৎসম্পর্কিত রোগের বিশেষজ্ঞ বলেন, ‘এদেশে চালু ‘বিশুদ্ধ’ নিরামিষ আহারে শর্করাজাতীয় খাদ্য (কার্বোহাইড্রেট), ট্রান্সফ্যাট (এক ক্ষতিকর চর্বিজাতীয় খাদ্য) বেশি আছে, ও প্রোটিন, ভিটামিন বি ১২, ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড কম আছে। শতকরা ৯০ জন ভারতীয়ের ভিটামিন বি ১২, ঘাটতি আছে, আর তাই পেশিও কমজোরি। . . . ওষুধের ব্যবস্থাপত্র যেমন মানুষ নির্বিশেষে একই হতে পারে না, তেমনি খাদ্যের ব্যাপারে পরামর্শও একজন মানুষের বিশেষত্বের ওপর ভিত্তি করেই করতে হয়। কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়, তা সে শর্করাজাতীয় খাদ্যই হোক, বা হোক মাংস বা তেল-চর্বি জাতীয় খাদ্য।’

রেড মিট (খাসি-গোরু-ভেড়া-শুকর ইত্যাদির লালচে মাংস, মুরগির থাই অংশ) ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সাহায্যে তৈরি মাংস শরীরের পক্ষে বেশি খারাপ। কিন্তু অন্তত কিছুটা পরিমাণে মাছ, ডিম, এমনকী মুরগির মাংসও সুষম খাদ্যের অত্যাবশ্যক অংশ—এমনই ভাবেন অধিকাংশ চিকিৎসক।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, মার্চ ১১, ২০১৬

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Vegetarian-food-beneficial-but-balanced-diet-is-key-to-health/articleshow/51352220.cms

সম্পাদকীয় মন্তব্য: আমাদের মনে হয়, খাদ্য নিয়ে দেশ জুড়ে যে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে দেখলে, সবার আগে দরকার খাদ্য জিনিসটা যে স্বাস্থ্যরক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ, এটা মনে রাখা। খাদ্য বেছে নেবার ব্যক্তিগত অধিকারকে সম্মান করতে হবে, আর সেই খাদ্য যেন মানুষের পুষ্টির প্রয়োজন ঠিকভাবে মেটায় সেটাও দেখতে হবে। বর্তমান সময়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতো সম্মানের পদে আসীন মানুষের পক্ষে খাদ্য নিয়ে কিছু বলার আগে খুব গভীরভাবে ভাবা উচিত যে তাঁর বক্তব্য যেন মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই কেবল উচ্চারিত হয়। এমন উচ্চপদাধিকারী কেউ রাজনৈতিক তাগিদ থেকে ধর্মীয় ফতোয়ার মতো খাদ্যাখাদ্য বিচার করে মন্তব্য করছেন, এমন সন্দেহের অবকাশও যেন না থাকে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

সোশ্যাল মিডিয়া: আধুনিক মননে তার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল

ইরাবতী আজকাল খুব অল্পতেই মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। সংসারের দায়িত্বগুলো সব বোঝা-র মতো মনে হয়। স্বামী সুজয়ের সঙ্গেও প্রায়ই খিটিমিটি লেগে যায় ছোটোখাটো বিষয়ে। হবে নাই-বা কেন? এখন তিনি কলেজে পড়া মেয়ে তিতাসের কাছ থেকে সব জেনেবুঝে নিয়েছেন আর বিরাট একটা বহির্জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছে এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এসে। হ্যাঁ, নিয়মিত ফেসবুকে চলছে তার পরিচিত-অপরিচিত বহু বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ। কী বিরাট জগৎ থেকে তিনি এতদিন বঞ্চিত ছিলেন। ঘরের কোণে বসে কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের এতগুলো বছর। কী দিয়েছে সুজয় তাকে? এই তো দেখছেন সবাই ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়া ঘুরতে যাচ্ছে। কুইন্সল্যান্ডের নীল দ্বীপে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে পোস্ট করেছে তাঁরই বান্ধবী পর্ণা। আর তিনি পুরী, দীঘা, ভাইজ্যাগ ছাড়া কিছু দেখতে পেয়েছেন? হীনম্মন্যতা এসে আষাঢ়ের কালো মেঘের মতো আচ্ছন্ন করে তোলে ইরার মন। কেমন যেন মনে হয় অনেক কিছুই হবার ছিল, কিন্তু হল না তাঁর। বিষণ্ণতা গ্রাস করে তাঁকে। ইরাবতী যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন এক সময়ে। এখনও তার আঁচ পান তিনি। যখন ফেসবুকে তাঁর প্রোফাইল আপডেট করেন তখন লাইকে-র বন্যা বয়ে যায়। কত কমেন্ট পড়ে। সব দুঃখ ভুলে যাওয়া যায় যেন এই 'ভারচুয়াল' সমাজে। তাই সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে এই কাল্পনিক সমাজে জুড়ে থাকাই ভালো এমনটা মনে হয় আজকাল। অপরাধবোধ যে আসে না এমন নয়। হয়তো যা করছেন ঠিক করছেন না এমন দ্বন্দ্বও আসে মাঝে মাঝে। ইরাবতী একলা নন। এমন অনেকেই আছেন যাদের মধ্যে আসছে আচরণগত পরিবর্তন। প্রশ্ন উঠছে তবে কি সোশ্যাল মিডিয়া এতটাই প্রভাব বিস্তার করতে পারে ব্যক্তির আচরণ বা ব্যক্তিত্বের ওপর? এই নিয়েই এবারের নিবন্ধ লিখেছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য**।

সোশ্যাল মিডিয়া

সোশ্যাল মিডিয়ার বঙ্গানুবাদ করলে সামাজিক মাধ্যম বোঝায়। সামাজিক মাধ্যম বলতে আধুনিক পৃথিবীতে কতগুলি ইন্টারনেট সাইটকে বোঝান হচ্ছে যার মাধ্যমে পৃথিবী জুড়ে মানুষজন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে এবং আলোচনা করে বা ছবি পাঠিয়ে বা ভিডিও পাঠিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভাবনা ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করতে পারে।

সামাজিক মাধ্যমগুলির মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত হল ফেসবুক। তা ছাড়াও আছে মাই স্পেস, ট্যুইটার, বেবো, লিঙ্কডিন ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্ন হল এই সামাজিক মাধ্যমগুলির উৎপত্তি কোন প্রয়োজনীয়তার থেকে। ফেসবুকের মিশন স্টেটমেন্টে বলা আছে—

"Facebook's mission is to give people to share and make the world more open and connected. People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what's going on in the world and to share and express what matters to them."

অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট জাল বিস্তার করে সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ স্থাপন। পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে পাঠানোর যুগ থেকে ই-মেলের যুগে পৌঁছানোর এই লম্বা যাত্রাপথ সুদীর্ঘ। এই সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে আমাদের পাওনা এই যে আগে যে যোগাযোগ করতে সময় লাগত মাসের পর মাস সেই যোগাযোগই আজ মাউসের একটা ক্লিকের অপেক্ষা মাত্র। কী পেলাম আমরা? বিরাট একটা জ্ঞান আদান-প্রদানের ক্ষেত্র, সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ, নিজস্ব মতামত আদান-প্রদানের সুবিধা। উন্নত যোগাযোগ ও প্রকৃত সমাজের সমান্তরাল আর এক 'ভারচুয়াল' সমাজ। সেখানেও আছে আলোচনা, সমালোচনা, কাদা ছোঁড়াছুড়ি, অশ্লীলতার দায়, বাহাদুরি কুড়োবার ইচ্ছা। আবার কখনো কখনো মননশীল মানুষ এই বিপুল যোগাযোগের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে চাইছেন উন্নত সমাজ গড়তে। মোদ্দা কথা হল, ভালো ও মন্দ দুই দিক নিয়েই সোশ্যাল মিডিয়া বাঁধ ভাঙা নদীর মতো প্রবেশ করেছে গোটা পৃথিবীর মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক্ সে পরিসংখ্যানের দিকে।

পরিসংখ্যান তত্ত্ব

পরিসংখ্যান বলছে পৃথিবীর প্রতি চারজন মানুষের একজন মানুষ ফেসবুক বা ট্যুইটার বা দুটোই ব্যবহার করেন। আমেরিকাবাসী দৈনিক গড়ে ৭.৬ ঘণ্টা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে ব্যস্ত থাকেন, এও দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার সর্বাধিক অনুর্দ্ধ তিরিশ বছর বয়স্কদের মধ্যে। এমনকী বয়স্ক (৬৫ বছর) মানুষের সংখ্যাও ২০১২ থেকে এখন বেড়েছে প্রায় দশ শতাংশ।

ভারতবর্ষের ছবিটাও একই রকম। ২০১২-র ডিসেম্বরে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারকারী ভারতবাসীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২০ লক্ষ। ফেসবুক ব্যবহার করছেন প্রায় ৫১০ লক্ষ লোক। ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রাহকের মনস্তত্ত্ব বুঝতে ফেসবুকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

অতি ব্যবহারের কুফল

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে এই তথ্য স্পষ্ট যে সোশ্যাল মিডিয়া এখন যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং ভারতবাসী তথা আপামর পৃথিবীবাসীর দৈনন্দিন জীবনে এক নিত্য প্রয়োজনীয় উপাচার। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাবহারিক উপযোগিতা এই নিবন্ধের মূল বিষয় নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার এই বহুল ব্যবহার কি ব্যক্তির আচরণকে ও মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করছে? করলে, তার প্রকৃতি কী? এটাই হল এই নিবন্ধের বিষয়।

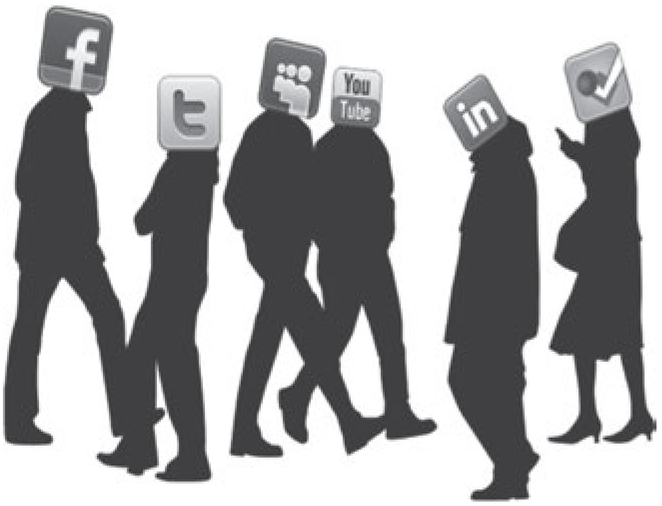

চিত্র ১. সোশ্যাল মিডিয়া কি পাশের মানুষটিকে 'অদৃশ্য' করছে?

সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব

ইন্টারনেটের দৌলতে প্রতি মূহূর্তে আমাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে অসংখ্য তথ্য (information) আর সেই বিরাট তথ্যের প্রবাহকে প্রক্রিয়াকরণের (processing) কাজ করে চলেছে আমাদের মস্তিষ্ক। ব্যস্ত সেই মস্তিষ্ক যখন সোশ্যাল মিডিয়া নামক এক ভিন্ন সামাজিক পরিসরের মুখোমুখি হল তখন তার প্রক্রিয়াকরণের ওপরও পড়ল প্রভাব। প্রথমত দেখে নেওয়া যাক সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবগুলি কী প্রকৃতির।

১. সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তিমূলক

সোশ্যাল মিডিয়ার একটা পোস্ট আর সঙ্গে সঙ্গে চলল 'লাইক' আর 'কমেন্টে'র বন্যা অর্থাৎ একটা আলোড়ন তোলা গেল ভারচুয়াল সমাজে। ফলে আচরণটি পুরস্কৃত হল। স্বাভাবিকভাবেই তখন এই সবার কাছ থেকে আসা স্বীকৃতির লোভ ব্যক্তির মধ্যে আসক্তির জন্ম দেয়। গবেষকরা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি ক্রমবর্ধমান আসক্তি মাপার জন্য এক নতুন স্কেল বার করেছেন — দ্য বার্জ ফেসবুক অ্যাডিক্শন স্কেল। অ্যাডিকশন্ অর্থাৎ কিনা আসক্তি নিয়ে দু-চার কথা বলা এক্ষেত্রে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আসক্তি মানে নিয়ন্ত্রণহীনতার (loss of control) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (subjective experience)। যেকোনো ধরনের আসক্তির অর্থাৎ নির্ভরতার (Dependence) সাধারণ কতগুলি স্নায়বিক উত্তেজনাপথ (neural pathways) ও স্নায়ু-রাসায়নিক (neuro-chemical) প্রক্রিয়া দেখা গেছে। কোনো দ্রব্যের প্রতি আসক্তি বা খাওয়ার প্রতি আসক্তি বা ফেসবুকের প্রতি আসক্তি সব ক্ষেত্রেই স্নায়বিক প্রক্রিয়াগুলি মোটের ওপর একই।

এমনকী এই সমস্ত আসক্তির ক্ষেত্রেই আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলিও এক—এমনটাই দাবি বিশেষজ্ঞদের। আসক্তির বিষয় থেকে বিরত থাকতে অপারগতা, আচরণগত নিয়ন্ত্রণ হারানো, আচরণগত সমস্যাগুলি চিনতে না পারা, আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণের অভাব, ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি—এই সবই হল যেকোনো ধরনের আসক্তির ফল, তা ফেসবুকই হোক বা মাদকদ্রব্য সেবন।

বিভিন্ন গবেষকের মতে মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সেন্টারগুলি মাদকাসক্তির জন্য যেমন সক্রিয় হয় তেমনি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারেও সেই সেন্টারগুলিই সক্রিয় হয়। অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার আসক্তিতে (addiction) পরিণত হবার স্নায়বিক ভিত্তি রয়েছে।

২. সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে অন্যের জীবনের সঙ্গে তুলনা

সোশ্যাল মিডিয়া-র বিভিন্ন পোস্ট—সুখী দম্পতির কণ্ঠলগ্ন হয়ে তোলা ছবি, নতুন গাড়ির চাবি হাতে সুখী গৃহিনীর ছবি, সন্তানের খুব বড়ো কোনো অ্যাচিভ্মেন্ট, ভালো ভালো খাবারের ছবি, ভালো ভালো উপদেশ ও কথা—এসবই বড্ড বড়ো 'আদর্শ পরিস্থিতি'। আর এই সব আদর্শ পরিস্থিতির সঙ্গে ক্রমাগত চলে নিজেদের তুলনা। কিন্তু মানুষ বা বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিগুলো অনেকক্ষেত্রেই আদর্শ বা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে না। ফল হীনম্মন্যতা ও বিষাদগ্রস্ততা। ২০১২ সালে ইউ. কে. (UK)-র একদল গবেষক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন এমন মানুষদের মধ্যে সার্ভে করে দেখেছেন তাদের মধ্যে ৫৩% বলেছেন সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার তাদের আচরণে প্রভাব ফেলেছে। আবার তাদের মধ্যে ৫১% বলেছেন সেই প্রভাব নেতিবাচক (negative)। তাদের মত অনুযায়ী অন্যের জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গে লাগাতার নিজেদের তুলনা করতে করতে তারা অনেকেই নিজের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন।

৩. সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তির মধ্যে অস্থিরতা তৈরি করে

উপরিউক্ত সার্ভে-তে অনেকেই স্বীকার করেছেন (দুই-তৃতীয়াংশ) যে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে না পারলে তাদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে যা পক্ষান্তরে আসক্তি-র (addiction) লক্ষণ।

৪. সোশ্যাল মিডিয়ার দরুন FoMo (Fear of Missing Out) দেখা যায়

সবাই যা করছে আমাকেও তা করতে হবে বা আমারও তাই করা উচিত এই বোধ ব্যক্তির ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, যাকে FoMo বলা হচ্ছে। সার্ভে করে দেখা যাচ্ছে ফেসবুক ও ট্যুইটার ব্যবহারকারীদের অনেকের মধ্যেই এই অনুভূতি দেখা যাচ্ছে যে তারা যথেষ্ট সফল বা স্মার্ট নয়। যার ফলে তৈরি হচ্ছে মানসিক উদ্বেগ।

৫. সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিকে বহুমুখী কাজের চাপে (multitasking) ফেলছে

গবেষকরা বলছেন আমাদের মস্তিষ্ক একই সঙ্গে দু-টি বিষয়ের ওপর পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারে না। ফলত একসঙ্গে অনেকগুলি কাজের চাপ মস্তিষ্কে দেওয়া হলে মস্তিষ্কের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (information processing) এবং উৎপাদন ক্ষমতাও হ্রাস পায়।

৬. সোশ্যাল মিডিয়া ও মানসিক স্বাস্থ্য

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের উদ্দেশ্য এখন আর শুধু যোগাযোগ স্থাপন নেই। কারণ খুঁজলে আপাতদৃষ্টিতে অনেক কারণ পাওয়া যাবে তবে গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে প্রধানত বাস্তব সমস্যা থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকার

জন্য ও একঘেয়েমি কাটানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার বেড়েছে। গবেষকদের মতে যারা মানসিক উদ্বেগে ভুগছেন ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাববোধ করেন তাঁরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো বেশি ব্যবহার করেন। প্রধানত মনোযোগ পাওয়ার ইচ্ছা ও নিজেদের আত্মতুষ্টি এই দুই প্রেষণা কাজ করে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্তিতে। বিশেষজ্ঞদের মতে ফেসবুক আসক্তি বাচ্চাদের মধ্যে ইমপালস্ কন্ট্রোল ডিসঅর্ডার তৈরি করতে পারে, সঙ্গে ডিপ্রেশন, আক্রমণাত্মক আচরণ ও অন্যান্য মানসিক বিকারের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

চিত্র ২. আসক্তি? তথ্য? প্রজ্ঞা? কী পাবে এই শিশু?

৭. সোশ্যাল মিডিয়ায় অপরাধ প্রবণতা

আজকাল প্রায়ই আমরা একটা কথা শুনি ‘সাইবার ক্রাইম’। সোশ্যাল মিডিয়া এই সাইবার ক্রাইমের একটি বিরাট বড়ো ক্ষেত্র। এখানে অনেকেই ভুয়ো ‘প্রোফাইল’ তৈরি করে বিভিন্নভাবে মানুষকে ঠকাতে চেষ্টা করেন। অশ্লীল ছবি পোস্ট করে, অন্যের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে বা আরও নানাভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করেন। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষভাবে দায়ী। অজানা অচেনা মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার রোমাঞ্চ উপভোগ করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই বিপদে পড়তে হয়, এমনটাই দাবি প্র্যাকটিসরত মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের। বিশ্বাসভঙ্গ বা অন্য ধরনের আঘাতে মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হলে অবশেষে ভুক্তভোগীকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে।

আর একটি বিষয় এক্ষেত্রে আলোচনাযোগ্য। সেটি হল ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব যা পরবর্তীকালে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে বাধ্য।

সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করে। ব্যক্তির যে ‘self’ অর্থাৎ সত্তা আছে তার দুটো দিক আছে। এক, ব্যক্তি কী হতে চায় এবং দুই, ব্যক্তি বাস্তবে কী? নিজের সম্বন্ধে ব্যক্তির ধারণা তার আচার-আচরণ, স্বভাব ইত্যাদি দ্বারা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ একটি আদর্শ সত্তা (Ideal self), অন্যটি বাস্তব সত্তা (Self image) এখন কাল রজার্স-এর ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের ভিতরে নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। তাঁর মতে এই পূর্ণ বিকশিত হওয়ার প্রধান শর্তই হল ব্যক্তির আদর্শ সত্তা ও বাস্তব সত্তার মধ্যে পার্থক্য হবে খুব কম। দু-টির মধ্যে সমতা বজায় থাকলে তবেই ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য হবে সুঠাম ও সুন্দর। এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যক্তি অন্যের চোখে নিজেকে আদর্শরূপে দেখাতে চায়, অর্থাৎ সে নিজের যে সত্তাটিকে বজায় রাখতে চায় (Ideal cyber self), যেন অন্যদের চোখে সে সেরকম বলেই প্রতিভাত হয়, এমনটাই সে চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তব জীবনে হয়তো দেখা গেল তার সত্তাটি অর্থাৎ self image-এর সঙ্গে তার বাস্তব-সত্তার তফাত থেকে যাচ্ছে। আদর্শ হয়ে ওঠবার তাগিদে নেতিবাচক দিকগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সত্যিকারের সমস্যার সমাধান না করে তাকে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে। ফলত জমে থাকা টানাপোড়েন মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলছে। এখন এই আদর্শ পরিস্থিতি দেখতে ও শুনতে শুনতে (ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে) ব্যক্তি বিশ্বাস করতে শুরু করে অন্যরা বোধহয় সবাই খুব ভালো আছে এবং একটা পরিপূর্ণ জীবনযাপন করছে। ফল হীনম্মন্যতা ও ডিপ্রেশন।

কিন্তু শুধুই নেতিবাচক নয় অনেক গবেষকরা এর উলটো কথাও বলেছেন যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আনন্দ ছড়িয়ে পড়তে পারে। অন্যের ভালো থাকার পোস্ট দেখে ব্যক্তিও হ্যাপি স্ট্যাটাস আপডেট দিতে উৎসাহিতবোধ করে। তাঁদের মতে এই ভালো থাকা ছড়িয়ে দিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। কিন্তু প্রশ্ন আবার সেইখানে এসেই দাঁড়াচ্ছে। এই ভালো থাকা কি বাস্তব ভালো থাকা নাকি ব্যক্তির দু-চোখে লেগে থাকা ভালো-থাকার স্বপ্ন আসলে পোস্টের মাধ্যমে রূপায়িত করছে তার আদর্শ সত্তাকে।

পরিশেষে বলা যায় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যকে কতটা প্রভাবিত করছে সে বিষয়ে আরও গবেষণার সুযোগ রয়েছে, এবং যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে এখনও আরও সময় লাগবে। তবে ব্যক্তির আচরণগত পরিবর্তন যে হচ্ছে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নেই। সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার ব্যক্তিকে আসক্ত করছে, অসামাজিক করে তুলছে।

কিন্তু আজকের এই আধুনিক যুগে সোশ্যাল মিডিয়া বর্জনও কোনো কাজের কথা নয়। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের সামনে উন্মুক্ত করছে বিরাট এক সম্ভাবনার জগৎ। প্রয়োজন হল তার সঠিক ব্যবহার ও উপযুক্ত প্রয়োগ।

১. সোশ্যাল মিডিয়ার ভিত্তিতে নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করা বন্ধ করা দরকার।

২. নিজের প্রকৃত সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা প্রয়োজন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বাহবা কুড়োনোর জন্য নিজে যা নই তা প্রমাণ করবার মরিয়া চেষ্টা না করাই ভালো।

৩. আর যদি আদর্শ সত্তাটিকে (Ideal self) অন্যের সামনে মেলে ধরতেই হয় তবে আসল সত্তার (real self) প্রতি অশ্রদ্ধা না রেখে তাকে আদর্শরূপে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এইভাবে আদর্শ সত্তার প্রতি আসল সত্তা গতিশীল হলে এক পূর্ণ বিকশিত জীবনযাপন সম্ভব। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

রুমঝুম ভট্টাচার্য, মনোবিদ, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকে যুক্ত আছেন।

বড়ো হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ—সরকারি কর্মচারীদের হয়রানি।

কাগজে কলমে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের চিকিৎসার যে সুযোগ পাবার কথা, তা তাঁরা পাচ্ছেন না—লিখেছেন **ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী**।

রমেনবাবুর সঙ্গে সেদিন পাড়ায় দেখা। কেমন আছেন জানতে চাইলে তাঁর দুরবস্থার কথা বলতে শুরু করলেন। রমেনবাবু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, CGHS বা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত। সমস্যাটা হল তাঁর ছেলেকে নিয়ে, ছেলের টনসিল-এর অপারেশন দরকার। সরকারি হাসপাতালে বেশ কয়েকবার গেছেন কিন্তু বেড মিলছে না, আর তা ছাড়া সরকারি হাসপাতালের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা এসব নিয়েও তাঁর যথেষ্ট আপত্তি। অবশেষে তিনি বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে গেলেন। সেখানে রেফার করাতে অবশ্য তাঁকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। CGHS-এর 'Wellness Centre' বা ডিসপেন্সারির বড়ো ডাক্তারবাবুকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে সেই হাসপাতালের নামকরা স্পেশালিস্টের কাছে তিনি পৌঁছোলেন বটে কিন্তু অপারেশনের তারিখ মিলছে না। কাগজপত্রের নানান ফ্যাকরা, নানান ত্রুটি ধরে অপারেশান-এর দিনই পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে অপারেশনের তারিখ পাওয়া গেল কিন্তু ভর্তি হতে গিয়ে জানলেন সেই হাসপাতালে এখন CGHS প্রকল্পে রোগী ভর্তি বন্ধ। যেহেতু আমি পেশায় চিকিৎসক তাই তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন তাঁর এই হয়রানির পিছনের কারণটা। রমেনবাবু তাঁর অফিসের সুজিতবাবুর হার্টের বাইপাস সার্জারি ওই একই বেসরকারি হাসপাতালে কোনো ঝক্কিঝামেলা ছাড়াই হয়ে গেছে যে কথাও বললেন। রমেনবাবুর ধারণা তাঁর প্রতি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে এই হয়রানি করা হয়েছে।

চিত্র ১. কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের সামগ্রিক চিকিৎসার জন্য তৈরি হয়েছিল সিজিএইচএস

CGHS ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতাধীন বেসরকারি সুপারস্পেশালিটির বড়ো হাসপাতালগুলোয় (WBHS) চিকিৎসা পেতে গিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বহু কর্মচারীর এমন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। 'Cashless' প্রকল্পের সুযোগ মিলছে না; যে অপারেশনের দরকার দেখা যাচ্ছে তার নামই লিস্টে নেই। বাধ্য হয়ে তাঁরা বেসরকারি হাসপাতালে নিজের টাকা খরচ করে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হচ্ছেন। কেন এমন হচ্ছে?

১৯৫৪ সালে চালু হওয়া কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের স্বাস্থ্য প্রকল্পে বর্তমানে দেশের ৫৬২-র বেশি বেসরকারি হাসপাতালে বড়ো বড়ো অপারেশনসহ চিকিৎসার জন্য চুক্তি হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্পে রাজ্যের বড়ো বড়ো বেসরকারি হাসপাতালে প্রকল্পভুক্ত কর্মচারী ও তার পোষ্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রথম ১ লক্ষ টাকার খরচ 'নগদ খরচ ছাড়া' বা Cash-less সুবিধে পাওয়া যাবে আর তার বেশি খরচ হলে অতিরিক্ত খরচের ৮০ শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসেবে সরকার দেবে।

কিন্তু দেখা যাবে হার্টের বাইপাস, হার্টের অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি, কিডনি প্রতিস্থাপন এরকম বড়ো বড়ো সার্জারি ছাড়া অন্যান্য রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পভুক্ত রোগীদের প্রচুর হয়রান হতে হয়। কারণটা তবে কী? কেন রমেনবাবুর মতো লোকেরা এই ঝামলার মুখোমুখি হচ্ছেন?

আমরা সকলেই জানি গত দু-দশকের বেশি সময় জুড়ে চিকিৎসার খরচ অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে এই চিকিৎসা কিনতে গিয়ে দেশের প্রায় ৬ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে চলে যাচ্ছেন। দেশের প্রায় ৩০ লক্ষ CGHS সুবিধাভোগী ও রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের উপরেও এই চিকিৎসার চাপ অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। সরকারের নয়া উদারনীতির ফলে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনিয়োগ কমছে, প্রয়োজনমতো শয্যা, চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য পরিকাঠামো বাড়ানো হচ্ছে না। বিশ্বব্যাঙ্কে এর নির্দেশমতো বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সঙ্গে চিকিৎসার চুক্তি হয়েছে। ২০১০ সালের হিসেব মতো জানা যাচ্ছে যে CGHS প্রকল্পের ১৬০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এইসব হাসপাতালগুলোর বিলের খরচ মেটাতে।

বোঝাই যাচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালের মুনাফার জন্য টাকাটা যথেষ্ট। কিন্তু এই টাকাটা মূলত উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর ও বড়ো খরচের অপারেশন বাবদ এই হাসপাতালগুলোকে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সরবরাহ করা দামি ওষুধ, যন্ত্রপাতি নির্ভর চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকার বিনিয়োগ

করছে। আর সে কারণে রমেনবাবুর অফিসের সুজিতবাবুর মতো লোকেরা বেসরকারি হাসপাতালে সহজে বাইপাস সার্জারির মতো বড়ো চিকিৎসা পান আর রমেনবাবুরা হয়রানির শিকার হন।

CGHS আর WBHS-এর চিকিৎসা ও অপারেশনের খরচের তালিকাটা দেখলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

যেমন ধরুন বেসরকারি বড়ো হাসপাতালগুলোর বহির্বিভাগে চিকিৎসকদের ফি ন্যূনতম ৩০০ টাকা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা বা তার বেশি। সেখানে CGHS প্রকল্পভুক্তদের জন্য ১৫০ টাকা। ওই এক হাসপাতালে সমান কাজ ও দায়িত্ব নিয়ে কোনো চিকিৎসক এই রোগীকে দেখতে যে বিশেষ আগ্রহী হবেন না তা বলাই বাহুল্য। রোগীর ড্রেসিং-এর জন্য বরাদ্দ ৫০ থেকে ৬০ টাকা। যেখানে পাড়ার একজন কম্পাউন্ডার ড্রেসিং করতে অন্তত ১০০-১৫০ টাকা নেন সেখানে কোনো চিকিৎসক যে এই টাকায় ড্রেসিং করবেন না তা বোঝাই যায়। শুধু কি তাই? বুকে জল জমলে বা হৃৎপিণ্ডের পর্দার নীচে জল জমলে তা বের করা একটা ঝুঁকিযুক্ত কাজ, সেখানে বরাদ্দ ১২০ টাকা থেকে ৩৮০ টাকা। অথচ ওই একই কাজ ওই সমস্ত হাসপাতালে করার রেট হল ১৫০০ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত।

একেকটা হাসপাতালে সরকার কোটি কোটি টাকা বিল বকেয়া রাখছে। সে জন্য মাঝে মধ্যেই অনুমোদিত হাসপাতাল CGHS বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারি প্রকল্পের চিকিৎসা বন্ধ করে দিচ্ছে, তখন রোগীরা সমস্যায় পড়ছেন। রোগীরা বুঝতে পারছেন না কেন এমন হচ্ছে?

সে কারণেই এ সমস্ত রোগীরা সেখানে রেফার হলেও হয়রানির শিকার হন। এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। রমেনবাবুর ছেলের টনসিলের অপারেশনের কথায় আসা যাক। CGHS লিস্টে এই অপারেশান বাবদ খরচ বরাদ্দ ৫০০০-৫৭৫০ টাকা। একটি মাঝারি হাসপাতালে তার খরচ অন্তত ১২ হাজার টাকা, বড়ো হাসপাতালের তার দেড় থেকে দুগুণ। বেসরকারি হাসপাতাল তাই এ সমস্ত রোগীদের বেলায় নানান অছিলায় টালবাহানা করে চলে।

খাদ্যনালীর ক্যান্সারের অপারেশন যেখানে খরচ প্রায় দেড়-দু লক্ষ টাকা সেখানে ওই একই হাসপাতালে বরাদ্দ ২৫ হাজার টাকা থেকে ২৮৭৫০ টাকা আর পিত্তথলির অপারেশনে খরচ ১০-১২ হাজার টাকা। যাঁরা একটু খোঁজখবর রাখেন তাঁরাই জানেন এসব জায়গায় পিত্তথলির অপারেশনে খরচ ২৫-৩০ হাজার টাকা বা তার বেশি।

কোনো রোগী যদি ICU-তে ভর্তি হন তাহলে ঘরভাড়া আলাদা আর বাকি পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য ৭৫০-৮৬৩ টাকা। একেকটা ICU-তে ৫০০০-১০০০০ টাকা প্রতিদিন, ওষুধপত্র পরীক্ষানিরীক্ষা আলাদা। সুতরাং কোনো জটিল গুরুতর রোগী যে সহজে এসব হাসপাতালে ঠাঁই পাবেন না

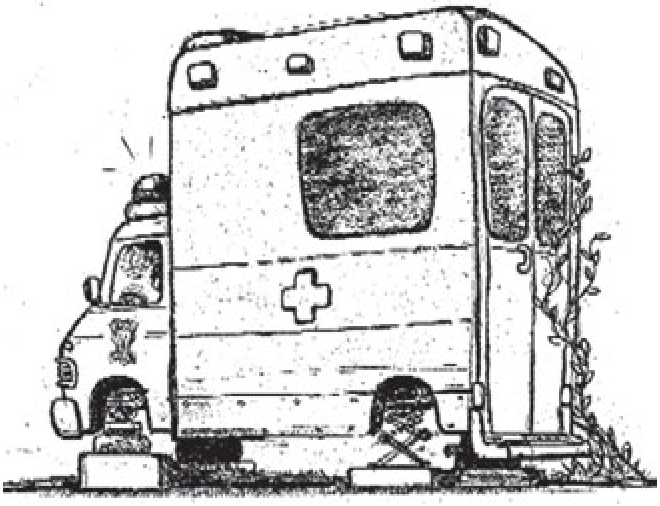

চিত্র ২. সরকারি স্বাস্থ্য-পরিষেবা বেহাল করার ফলেই রোগীরা চাইছেন বেসরকারি পরিষেবা

এটা বুঝতে পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই বরাদ্দটা কিছুটা বেশি হলেও তাও অনেকটা কম।

তা হলে CGHS প্রকল্পে বেসরকারি হাসপাতালগুলো চুক্তি করে কেন? করোনারি বাইপাসসহ হার্টের জটিল অপারেশনের প্যাকেজ ১ লক্ষ ১৪ হাজার থেকে দেড় লক্ষ টাকা যা হাসপাতালগুলোর কাছে লাভজনক। করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি ১০ হাজার টাকা, দামি ও লাভজনক। সংখ্যায় বেশি রোগী দিয়ে লাভ ভালোই। কিডনি প্রতিস্থাপনের বেলাতেও তাই। এসমস্ত হিসেব করে বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা CGHS বা সরকারি প্রকল্পগুলোর সঙ্গে চুক্তি করছে। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে দামে পোষাচ্ছে না সেখানে কায়দাকানুন, ফন্দিফিকির আর হয়রানি।

এর পরও সমস্যা রয়েছে। একেকটা হাসপাতালে সরকার কোটি কোটি টাকা বিল বকেয়া রাখছে। সে জন্য মাঝে মধ্যেই অনুমোদিত হাসপাতাল CGHS বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারি প্রকল্পের চিকিৎসা বন্ধ করে দিচ্ছে, তখন রোগীরা সমস্যায় পড়ছেন। রোগীরা বুঝতে পারছেন না কেন এমন হচ্ছে? তারা অসহায়ভাবে এক দরজা থেকে অন্য দরজায় দৌড়োচ্ছেন, কোনো সুরাহা হচ্ছে না।

সরকারি কর্মচারী ও তাদের সংগঠনকে এ বিষয়ে অবিলম্বে ভাবতে হবে, সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। দাবি করতে হবে এই ভাঁওতা বন্ধ করে সরকারি পরিকাঠামো উন্নত করে সরকারি কর্মচারীদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

হিসেব কষে দেখিয়ে দেওয়া যাবে যে হাজার হাজার কোটি টাকা CGHS ও সরকারি প্রকল্প থেকে বেসরকারি হাসপাতালকে মুনাফা করার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে সেই টাকা সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়নে ব্যয় করা হলে অনেক বেশি সংখ্যক কর্মচারী ও তার পোষ্যদের চিকিৎসা দেওয়া যেত। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী, এমবিবিএস, ডিএনবি, এমসিএইচ, কার্ডিওথোরাসিক সার্জন। বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত।

বিপর্যয়ের মুখোমুখি ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা

ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত

সূচনা

ভারত ১৯৪৭ সালে প্রায় দু-শো বছরের ইংরেজ শাসনের হাত থেকে রাজনৈতিক মুক্তি পেয়েছে। তারপর আমাদের সামরিক শক্তি অনেক বেড়েছে, আমরা মঙ্গলে মহাকাশযান পাঠিয়েছি, চাঁদেও মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করছি। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা আমেরিকার সহযোগিতায় রাষ্ট্রসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে স্থায়ী সদস্যপদ পেতে চলেছি।

কিন্তু শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, গ্রামের বিপুল বেকার সমস্যা ও দারিদ্র নিরসনে আমাদের ভূমিকা কেমন? শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণ, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও চিকিৎসাব্যবস্থা খাতে কতদূর এগিয়েছি আমরা? মনে হচ্ছে দলমত নির্বিশেষে ভারতে সব নীতিনির্ধারকরাই স্বাস্থ্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত অনাগ্রহী। কিন্তু মানুষের বিকাশে এটাই সবচেয়ে বড়ো পদক্ষেপ। ভারতের স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছেন শতকরা ২০ জন, আর বাকি ৮০ জন চরম অপুষ্টি ও ক্ষুধার শিকার; তাঁর নিরক্ষর, গৃহহীন আর সহজে প্রতিরোধ করা যায় এমন রোগে ভুগছেন, কেননা সাধারণ স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই। দেশটা ওপর নীচে দুটো স্তরে ভাগ হয়ে আছে।

১৯৪৮ সালে গৃহীত রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সনদে স্পষ্ট বলা আছে, রাজনৈতিক অধিকার যথেষ্ট নয়। যেকোনো মানুষের বা জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করতে হবে। ভারত রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সনদে বলা কথাগুলোর সঙ্গে একমত। ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ বলছে :

‘‘কোনো মানুষকে তার জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে আইনি পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ ছাড়া বঞ্চিত করা যাবে না।’’

জীবনের অধিকার ভারতের সংবিধানের এক মূল স্তম্ভ ও নির্দেশ-নীতি, একে না মেনে কিছু করা অসাংবিধানিক। অনেক প্রাদেশিক উচ্চ-আদালত ও দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় দেখিয়েছেন যে স্বাস্থ্যের অধিকার ও চিকিৎসার অধিকার জীবনের অধিকারের অন্যতম স্তম্ভ। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি বলেছেন, ‘‘জীবনের অধিকার মানে কেবল জন্তুর মতো বেঁচে থাকার অধিকার নয়, তা হল মানবিক মর্যাদার সঙ্গে বাঁচবার অধিকার।’’ কিন্তু এত কিছু কথার পরেও স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়।

সরকারের দ্বাদশ যোজনা কমিশন সারা দেশে ‘সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা’র কথা খতিয়ে দেখতে ডা. শ্রীনাথ রেড্ডির সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ দল গড়েছিলেন। সেই বিশেষজ্ঞ দল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টে জাতি-ধর্ম-গোত্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের স্বাস্থ্য পরিষেবা যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সেটা পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে। অথচ পূর্বতন ও বর্তমান সরকার সেই সুপারিশ আদৌ কার্যকর করেননি।

আমরা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের জনস্বাস্থ্যের চেহারাটা একবার দেখে নিই।

কিছু জনগোষ্ঠী-বিষয়ক পরিসংখ্যান

৩৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিশাল দেশ ভারতে ১২৭ কোটি মানুষ আছেন, অর্থাৎ পৃথিবীর মাত্র শতকরা ৪ ভাগ এলাকায় শতকরা ১৬ ভাগ মানুষ। ফলে জনঘনত্ব খুব বেশি। তার মধ্যে শতকরা ৩৭ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে—যদি দারিদ্র্যসীমা বলতে দৈনিক মাত্র ১৪০০-১৬০০ কিলো-ক্যালোরি শক্তি দেবে, এমন খাবারটুকুই কিনে খাবার সার্মথ্য বোঝায়। অন্য কোনোরকম অত্যাবশ্যক মানবিক প্রয়োজন পূরণ এতে সম্ভব নয়। সুষম খাদ্য, আশ্রয়, পোশাক, শিক্ষা বা বিনোদন দারিদ্র্যসীমার এই হিসেবে ধরাই হয় না। আন্তর্জাতিক মান অনুসারে যদি দৈনিক এক ডলার (বা ৬৫ টাকা) খরচে সামর্থ্যকে দারিদ্র্যসীমার নির্ণায়ক বলে ধরি, তবে এদেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে।

অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে মোট খরচের শতকরা মাত্র ১.০২ ভাগ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়-বরাদ্দ। সরকার ও বেসরকারি খরচ মিলিয়ে দেখলে মোট জিডিপি-র শতকরা ৪ ভাগেরও কম হল স্বাস্থ্যখাতে খরচ। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট-বরাদ্দের শতকরা ১৩ ভাগ প্রায় প্রতিরক্ষা আর ১৭ ভাগ যায় ঋণশোধ (সুদ ও আসল) করতে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর থেকে ক্রমাগত স্বাস্থ্যখাতে বাজেটের ব্যয়বরাদ্দের অংশ কমেছে। প্রথম ইউপিএ সরকার (২০০৪-২০০৯) ক্ষমতায় আসার আগে সেই জোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল স্বাস্থ্যখাতে বাজেটের ব্যয়বরাদ্দ আস্তে আস্তে বাড়িয়ে শতকরা ৩ ভাগ করা হবে। হয়নি। উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ দল বলেছে, ‘‘সরকারের (রাজ্য ও কেন্দ্রীয়) স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় বর্তমান জিডিপি-র শতকরা ১.৪ ভাগ থেকে বাড়িয়ে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে অন্তত শতকরা ২.৫ ভাগ, ও ২০২২ সাল নাগাদ অন্তত শতকরা ৩ ভাগ করা উচিত।’’ তাও মানা হয়নি।

এবার আমরা ভারতের মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের অবস্থার দিকে এক ঝলক তাকাই।

সারণি ১

ব্যাধি	কতজন আক্রান্ত
১. রক্তাল্পতা	শতকরা ৫৭.৯ জন
২. অ-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই দ্বারা বাড়িতে জন্ম	শতকরা ৫৩ জন
৩. শিশু মৃত্যুর হার (এক বছরের নীচে)	প্রতি হাজারে ৫২ জন
৪. পাঁচ বছরের নীচে শিশুমৃত্যুহার	প্রতি হাজারে ৬৬ জন
৫. জন্মের সময় কম ওজন	শতকরা ৪৪ জন
৬. শিশুদের (৬ মাস-৩ বছর) রক্তাল্পতা	শতকরা ৬৮ জন
৭. মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি লক্ষে ২১২ জন
৮. শিশুদের উচ্চ মাত্রার অপুষ্টি	২.১০ কোটি

ভারতের স্বাস্থ্যের অবস্থা অন্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে, কেননা ভারত অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বের সব থেকে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেশগুলোর অন্যতম, এবং বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশের মধ্যে উঠে আসার দাবি রাখে।

সারণি ২

স্বাস্থ্যসূচক	ভারত	চীন	ব্রাজিল	শ্রীলঙ্কা	থাইল্যান্ড
শিশুমৃত্যুর হার/প্রতি হাজার জীবন্ত শিশু জন্মপিছু	৫২	১৭	১৭	১৩	১২
৫ বছরের নীচে মৃত্যুহার/প্রতি হাজার জীবন্ত শিশু জন্মপিছু	৬৬	১৯	২১	১৬	১৩
পুরো টিকা পেয়েছে এমন শিশুর শতকরা হার	৬৬	৯৫	৯৯	৯৯	৯৮
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়কের হাতে শিশুজন্মের শতকরা হার	৪৭	৯৬	৯৮	৯৭	৯৯

অন্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় অনেক কম হবার দরুন এ দেশে স্বাস্থ্যের হাল ভালো নয়। পরবর্তী সারণিতে সেটা স্পষ্ট।

সারণি ৩

দেশ	সামগ্রিক সরকারি খরচের শতকরা কত অংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয়	জিডিপি-র শতকরা কত অংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয়
ভারত	৪.১	১.৪
শ্রীলঙ্কা	৭.৩	১০
চীন	১০.৩	২.৩
থাইল্যান্ড	১৪.০	৩.৩

চিকিৎসার ন্যূনতম ব্যবস্থা এ দেশে নেই, আর প্রতি হাজার জনসংখ্যা-পিছু হাসপাতালের শয্যাসংখ্যার দিকে তাকালে সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। এ ব্যাপারে একটা তুলনামূলক চিত্র নীচের ৪-এ পাওয়া যাবে।

সারণি ৪

দেশ	শয্যাসংখ্যা/১০০০ জনসংখ্যা পিছু
ভারত	০.৯
চীন	৩.০
শ্রীলঙ্কা	৩.১
ব্রাজিল	২.৪
থাইল্যান্ড	২.২

ভারতের প্রতি বছর পাঁচ বছরের কম বয়সি মোটামুটি ২০ লক্ষ শিশু মারা যায়, যা হল সারা পৃথিবীর মোট শিশুমৃত্যুর চারভাগের একভাগ। প্রতিদিন এ দেশে ৫০০০ শিশু মারা যায়, তার মোটামুটি শতকরা ৪৬ ভাগ হল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপুষ্টিজনিত কারণে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ

পকেটের পয়সা খরচ করে স্বাস্থ্যপরিষেবা পাবার ব্যাপারে (out of pocket expenditure) ভারত বিশ্বে অগ্রগণ্য। একদিকে দরিদ্র জনসাধারণ পকেটের পয়সা খরচ করে স্বাস্থ্য পরিষেবা কিনছে, অন্যদিকে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে, আর এর ফলে মধ্যবিত্ত ও গরিবরা অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

গড়পড়তা ভারতীয়ের একবার হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ হল তার সারা বছরের রোজগারের শতকরা ৫৮ ভাগ; আর রোগীদের পরিবারের শতকরা ৪০ ভাগ এই খরচ মেটাতে গিয়ে ধার করতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রত্যেক বছর মোটামুটি দুই কোটি মানুষ স্বাস্থ্য-চিকিৎসাজনিত কারণে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যায়। স্বাস্থ্যজনিত মোট খরচের শতকরা ৮৩ ভাগই হল পকেট থেকে খরচ। বর্তমান জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ধনীর পক্ষে, আর শহরকেন্দ্রিক। চিকিৎসকদের শতকরা ৮০ ভাগ, ডিসপেন্সারিগুলোর শতকরা ৭৫ ভাগ, আর হাসপাতালগুলোর শতকরা ৬০ ভাগ শহরে। শহরাঞ্চলে দশ হাজার মানুষ পিছু গড়ে ১১.৩ জন ডাক্তার রয়েছেন, আর গ্রামাঞ্চলে দশ হাজার মানুষপিছু ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র ১.৯। মোট ৪,৫০,৩৬০ হাসপাতাল শয্যার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের চাইতে কম (১,০২,৭৩৬) আছে গ্রামাঞ্চলে।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের আলমা আটা শহরে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ-এর যৌথ সম্মেলন ‘‘২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য’’-প্রস্তাব গৃহীত হয়, আর ভারত সেই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে। এই সম্মেলনে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মৌলিক মানবাধিকারের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়। বলা হয়—

> ‘‘এই সম্মেলন জোরের সঙ্গে একথা ঘোষণা করছে যে স্বাস্থ্য হল শরীর ও মনের পূর্ণ ভালো থাকা ও কেবলমাত্র কোনো রোগের অনুপস্থিতি নয়, এবং তা একটি মৌলিক মানবাধিকার, এবং সম্ভাব্য চূড়ান্ত মাত্রায় স্বাস্থ্যলাভ বিশ্বের অন্যতম প্রধান সামাজিক লক্ষ্য, আর তার জন্য স্বাস্থ্যখাত ছাড়াও অন্য নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতেও কাজ করা দরকার।’’

২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্যকে বাস্তবায়িত করতে নানা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল। তাদের কয়েকটি হল:

- মোট জিডিপি-র অন্তত শতকরা ৫ ভাগ স্বাস্থ্যখাতে খরচ করা হবে।
- সমস্ত শিশুর অন্তত শতকরা ৯০ ভাগ বয়সের অনুপাতে ঠিক ওজনের হবে।
- নিরাপদ পানীয় জল সব বাড়িতে বা তার থেকে ১৫ মিনিট হাঁটা পথের মধ্যে পাওয়া যাবে।
- সব বাড়িতে বা তার খুব কাছে শৌচালয় ব্যবস্থা থাকবে।
- গর্ভাবস্থায় ও শিশুর জন্মের জন্য মায়েরা প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা সহজে পাবেন।
- অন্তত এক বছর বয়স পর্যন্ত উপযুক্ত শিশুযত্নের ব্যবস্থা থাকবে।

উল্লেখ্য যে ২০১২ সাল পর্যন্ত ভারত-এর একটি লক্ষ্যমাত্রাও পূর্ণ করতে পারেনি।

ভারতে রোগের ভার

সংক্ষেপে, ভারত হল সংক্রামক ও অপুষ্টিজনিত রোগের বিশ্ব-রাজধানী। সারণি ৫ দেখলে আমাদের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ৫

রোগ	মোট রোগীর সংখ্যা	বার্ষিক মৃত্যুহার	বিশ্বে স্থান
যক্ষ্মা	১৫০ লক্ষ	৫ লক্ষ	প্রথম
ডায়রিয়া	বছরে ৫৫ লক্ষ	১০ লক্ষ	প্রথম
ম্যালেরিয়া	বছরে ২২ লক্ষ	২৫০০০	প্রথম
কুষ্ঠ	৪০ লক্ষ	-	প্রথম
অন্ধত্ব	৩৫ লক্ষ	-	প্রথম
রিউম্যাটিক হার্টের রোগ	১০ লক্ষ	?	প্রথম
নিউমোনিয়া	বছরে ৪০ লক্ষ	৮ লক্ষ	প্রথম
এইচ আইভি/ এইডস	৩ কোটি	?	প্রথম/ দ্বিতীয়
অন্য যৌনরোগ	৫০ লক্ষ	-	প্রথম
অপুষ্টিজনিত রোগ	২.৫ কোটি	?	প্রথম

অসংক্রামক রোগের ভারও বিশাল। ডায়াবেটিস মেলিটাস বা মধুমেহ ছড়াচ্ছে প্রায় দাবানলের মতো। এখন মধুমেহ রোগীর অনুমিত সংখ্যা ৬.১ কোটি, আর ২০৩০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ১০.১ কোটি। উচ্চ রক্তচাপের রোগীর বর্তমান সংখ্যা ১৩ কোটি, আর সেটা ২০৩০-এ দ্বিগুণ হবে। তামাকের নেশার কারণে মৃত্যু বাড়ছে। স্ট্রোকজনিত কারণে মৃত্যু ও পক্ষাঘাতের বর্তমান সংখ্যা বছরে ৯২ লক্ষ, সেটা ২০৩০-এর দশকে প্রায় দ্বিগুণ হবে।

ওষুধের দাম

উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ দল 'সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা'র কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, পকেট থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য মানুষ যে খরচ করেন তার অধিকাংশই, বা মোটামুটি শতকরা ৭০ ভাগ, ব্যয় হয় ওষুধ কিনতে। এই বিশেষজ্ঞ দল খুব জোর দিয়ে বলেছেন, সমস্ত সরকারি হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া দরকার। ওষুধের মূল্য নিয়ে এই নিবন্ধে আলোচনা করার পরিসর নেই। সংক্ষেপে বলা যায়, ২০০5 সালে ভারতের সংসদে যে নতুন পেটেন্ট আইন পাশ করা হয়েছে তাতে এদেশীয় ওষুধ কোম্পানির তৈরি কম দামের জেনেরিক ও অন্য ওষুধ তৈরির ব্যাপারটা খুবই ব্যাহত হয়েছে। ১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইনের বলে ভারতীয় ওষুধ কোম্পানিগুলোর অনেক বৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু উলটো পথে বিরাট যাত্রা এখনই শুরু হয়ে গেছে। ওষুধ তৈরির 'পদ্ধতি পেটেন্ট'-এর বদলে 'দ্রব্য পেটেন্ট', 'কমপালসারি লাইসেন্সিং' ব্যবস্থা বাতিল, এসব ব্যাপক সমস্যা করছে। বহুজাতিক ও 'অধিজাতিক' দৈত্যাকার কোম্পানিগুলো ভারতের আভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজারের (যার মোট মূল্য এক লক্ষ কোটি টাকা) অধিকাংশের দখল নিয়ে নিয়েছে, আর বাজারে তাদের অংশ দিনে দিনে বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ওষুধ-নীতি সাধারণ মানুষের বিপক্ষে গেছে। তাই ওষুধের মূল্য আকাশছোঁয়া।

নীতির পরিবর্তনের মূল দিকগুলো হল

১. কেবলমাত্র সরকারি (পাবলিক সেক্টর) কোম্পানির দ্বারাই তৈরি হবে এমন ওষুধের তালিকা তুলে দেওয়া।
২. ওষুধশিল্পে শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশি পুঁজি লগ্নির অনুমতি দান।
৩. অত্যাবশ্যক ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া।
৪. বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেওয়া।
৫. পাবলিক সেক্টর ওষুধ কোম্পানির জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে তাদের বাজারি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করা।

জাতীয় ওষুধ সংক্রান্ত নীতি বলছে:

"মুক্ত অর্থনীতি ও নয়া 'দ্রব্য পেটেন্ট' রাজত্বে যে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ আসছে, তার সুযোগ নেবার জন্য দেশীয় ওষুধ ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পকে ঢেলে সাজাতে হবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের সময়সীমা অনেকটা কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

এর ফল হল, ওষুধের দামের বলগাহীন দ্রুত বৃদ্ধি।

সারণি ৬

মূল্য-নিয়ন্ত্রণের অধীন ওষুধ	১৯৭৯	১৯৮৭	১৯৯৫	২০০৩
	৩৪৭	১৪২	৭৬	৭৪

তার ওপর ভারতের ওষুধ-বাজার অসংখ্য ভেজাল ওষুধ, বিপজ্জনক ও অবৈজ্ঞানিক মিশ্রিত ওষুধ, নিষিদ্ধ ওষুধ ও কোনো ডাক্তারি বইতে উল্লেখই নেই এরকম নানা এলোমেলো 'ওষুধ'-এ ভর্তি। সরকারের ভুল নীতি ও ডাক্তার-ওষুধ কোম্পানির ভাই-বেরাদরির কারণে কর্পোরেটগুলোর জন্য ভারতের ওষুধ-বাজার খুব ভালো মৃগয়াক্ষেত্র। ভুগছে সাধারণ মানুষ।

সিদ্ধান্ত

নড়বড়ে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নের তাগিদে উপযুক্ত ব্যবস্থা বের করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার (২০০৯-২০১৪) ২০০৯ সালে শ্রীনাথ রেড্ডির নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ দল নিয়োগ করেছিল। দেশের সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছিল। অনেক দেখেশুনে রেড্ডি কমিটি তার রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছে। সেই রিপোর্টের মূল প্রস্তাবের সারকথা হল:

১. স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সরকারের দায়িত্ব।
২. সমস্ত দেশবাসীকে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া উচিত।
৩. সরকারকে সব অত্যাবশ্যক ওষুধ বিনামূল্যে দিতে হবে।
৪. সরকার স্বাস্থ্য বিষয়ে বেসরকারি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে।
৫. ব্যবহারকারীদের মূল্য দেবার বাধ্যবাধকতা, সরকার-বেসরকার অংশভাগ (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) দ্বারা স্বাস্থ্যপরিষেবা, ও স্বাস্থ্যবিমার ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে তুলে দিতে হবে।

রেড্ডি কমিটি দেখিয়েছে এটা খুবই সম্ভব ব্যাপার; বাজেটের মাত্র ১ থেকে ২ শতাংশ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ করলেই হবে। কিন্তু সরকার রেড্ডি কমিটি প্রস্তাবগুলোর একটাও কাজে লাগায়নি, বরং তারা আরও বেশি বেসরকারিকরণের পথে হেঁটেছে। ২০১৪ সালে সরকার বদলেছে, নতুন এনডিএ সরকার আরও আগ্রাসীভাবে ‘‘মুক্ত অর্থনীতি, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন’’-এর পথে চলেছে। স্বাস্থ্যখাতে যে সামান্য বাজেটবরাদ্দ ছিল সেটাও তারা নির্মমভাবে কাটছাঁট করেছে আর সমস্ত স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্রটাকেই ধাপে ধাপে বেসরকারিকরণের মতলব ঘোষণা করেছে।

সুতরাং আমরা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এক সামগ্রিক মহাপতনের দিকে এগিয়ে চলেছি। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত, এমবিবিএস, এমডি, চিকিৎসক ও প্রাবন্ধিক।

টুকরো খবর

যেকোনো দাতার কাছ থেকে নেওয়া কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব

কিডনির অনেক রোগের শেষ ও একমাত্র চিকিৎসা হল কিডনি প্রতিস্থাপন। ব্যাপারটা বেশ খরচসাপেক্ষ, কিন্তু খরচ করলেই সমস্যা মিটবে না। ঠিক যেমন চোখের কিছু কিছু রোগে অন্য মানুষের কর্নিয়া নিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হয়, এবং তাই অনেক দৃষ্টিহীন বছরের পর বছর অপেক্ষা করে থাকেন কবে কর্নিয়া পাওয়া যাবে, কিডনির কঠিন অসুখেও ব্যাপারটা অনেকটা একই রকম। অনেকটা একই রকম বটে, কিন্তু পুরো একরকম নয়। কেননা দৃষ্টিহীন মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর জন্য অন্য জীবিত মানুষের কর্নিয়া নেওয়া চলে না, মৃত মানুষের কর্নিয়া নিতে হয়, তাই মরণোত্তর ‘চক্ষুদান’ নিয়ে প্রচার চলে। কিন্তু কিডনি প্রতিস্থাপন করতে গেলে আবার জীবিত মানুষের কিডনিই দরকার।

তাতে কিডনি দান করেন যে মানুষ, তাঁর কোনো ক্ষতি হয় না? না, হয় না। প্রত্যেক মানুষের শরীরে দুটো করে কিডনি থাকে। সুস্থ কিডনি থাকলে একটা কিডনিতেই একজন মানুষের স্বাভাবিক কাজ চলতে অসুবিধা হয় না। তাই একটা কিডনি যেকোনো মানুষ (কিছু বিরল ব্যতিক্রম বাদে) দান করতেই পারেন।

দান তো করতে পারেন কিন্তু যাঁর দরকার তিনি কি যে কারও কিডনি গ্রহণ করতে পারেন? না, তা পারেন না। যেকোনো মানুষের কিডনি আর এক জনের শরীরে বসালে, শরীরের স্বাভাবিক অনাক্রম্যতা ক্ষমতা (ইম্যুনিটি) সেই কিডনিকে বর্জন করবে। ডাক্তাররা বলেন গ্রাফট রিজেকশন। এই গ্রাফট রিজেকশন শরীরে যে রোগ সৃষ্টি করে, তার জেরেই কিডনি-পাওয়া রোগী প্রায়শই মারা যান, নতুন-পাওয়া কিডনি কাজ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে কার কিডনি গ্রহণ করবে? সবথেকে ভালো হয় যদি রোগীর কোনো হুবহু যমজ ভাই বা বোন থাকে, তার শরীরের কিডনি রোগীর শরীর স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সেরকম সৌভাগ্য আর ক-জনের হয়? রোগীরা সেই কিডনি গ্রহণ করেন যার সঙ্গে তাঁর রক্তের গ্রুপ ও আরও কিছু জেনেটিক সাযুজ্য পাওয়া যায়। এরকম লোক পাওয়া ও তাঁকে কিডনি দানে সম্মত করানো খুব শক্ত ব্যাপার। তাই মৃতদেহ থেকে কিডনি নিয়ে সেটা জীবিত মানুষের দেহে বসানোও হচ্ছে, কিন্তু তাতে প্রতিস্থাপন-পরবর্তী সমস্যা বেশি হচ্ছে, রোগী বেশিদিন বাঁচছেন না।

ডাক্তাররা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছিলেন যাতে রোগী যেকোনো মানুষের কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন। সম্প্রতি আমেরিকার জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জনরা এই রকম কিডনি প্রতিস্থাপন করে শতকরা ৯৩ শতাংশ সাফল্য অর্জন করেছেন। এই পদ্ধতির মূল ব্যাপারটা খুব দুর্বোধ্য নয়। কিডনি নেবেন যে রোগী, তাঁর রক্তের মধ্যেকার যেসব অ্যান্টিবডি বাইরে থেকে আসা কিডনকে থিতু হতে দিত না, সেই অ্যান্টিবডিগুলো ডাক্তাররা রক্ত ছেঁকে নিয়ে বের করে দিয়েছেন। তারপর রোগীকে কিছু ওষুধ দিয়েছেন যাতে অমন অ্যান্টিবডি যেন ফিরে না আসে।

জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২৯ জন রোগীর মধ্যে ২৭ জনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সফল হয়েছে। আট বছর ধরে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যাঁরা কিডনি পাবার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে ছিলেন, বা যাঁদের শরীরে মৃতদেহ থেকে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল, তাঁদের চাইতে নতুন পদ্ধতিতে রোগী বেশি বাঁচছেন। জন হপকিন্স-এর প্রতিস্থাপন সার্জেন রবার্ট মণ্টগোমরি বলেছেন, নতুন পদ্ধতি মৃতদেহ থেকে কিডনি নিয়ে প্রতিস্থাপন করার চাইতে অনেক ভালো। জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির প্রেস বিজ্ঞপ্তির ভাষায়, ‘‘[মৃতদেহের কিডনি প্রতিস্থাপনের তুলনায়] এই পদ্ধতিতে নতুন-বসানো কিডনি সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করে দেয়, হাসপাতালে রোগীকে মাত্রা অর্ধেক দিন ভর্তি থাকতে হয়, খরচ কমে, আর প্রতিস্থাপিত কিডনি টেকে দ্বিগুণ।’’

রোগীর রক্তের তরল অংশ বা প্লাজমা আলাদা করে নিয়ে তা ফেলে দেওয়া হয়, ফলে অ্যান্টিবডিগুলোও শরীরের বাইরে চলে যায়। রক্তকোষগুলোকে রোগীর শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর তারপর শিরার মধ্যে দিয়ে রোগীকে এমন ওষুধ দেওয়া হয় যাতে অ্যান্টিবডিগুলো রোগীর শরীরে আর ফিরে না আসতে পারে। বলতে সহজ হলেও, এটা কার্যক্ষেত্রে করতে গেলে খুবই উচ্চমানের প্রযুক্তি প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, মার্চ ১১, ২০১৬।

http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Kidney-transplant-from-any-donor-possible/articleshow/8650385.cms তে লভ্য। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

বই পড়া

স্বাস্থ্যের উৎস সন্ধানে

ডা. স্মরজিৎ জানা, দুর্বার প্রকাশনী, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৬। মূল্য ১৫০ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪

ডা. জয়ন্ত দাস

১৪৪ পাতার বই, অনেকগুলো প্রবন্ধ, অনেকটা যেন প্রবন্ধ-সংকলনের আদলে একমলাটে ঢুকে পড়া। কিন্তু ভালো করে পড়লে বোঝা যায়, সংকলন নয়, একটাই লেখা। ''ঈশ্বর, রোগ, এবং মানুষ'' থেকে ডা. স্মরজিৎ জানা-র যাত্রা শুরু। রোগ নিয়ে মানুষের পুরোনো ধারণার সঙ্গে পরীক্ষায় পাওয়া ফলের ভিত্তিতে পাওয়া নতুন ধারণার কথা বলা। কেন রোগ হয় আর কেনই-বা সবার রোগ হয় না—বলতে গিয়ে এখানে অবশ্য পুরোটা বলেননি স্মরজিৎ, একটানে ওইভাবে পুরো বলাটা সম্ভবও নয়, বলেছেন জীবাণুঘটিত রোগের কথা। এখান থেকে শুরু করলে সেটা ঐতিহাসিক-ভাবেও ঠিক, কেননা মানুষ প্রথম জেনেছে এই রোগগুলোই। বাইরের 'শত্রু' আক্রমণে হওয়া রোগ আবার বুঝতেও সুবিধে, তার ঠেকানোর প্রযুক্তিগত জটিলতা থাকলেও এধরনের রোগের চিকিৎসার মূল সূত্র কিন্তু সরল। কিন্তু রোগ নিয়ে বিজ্ঞানের চেনা ছকের কথাগুলি বলেই থেমে থাকেননি লেখক, সমাজের সঙ্গে রোগ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার সম্পর্কগুলো কাটাছেঁড়া করেছেন নিপুণ দক্ষতায়।

'টিকা ইত্যাদির সাহায্যে আমরা রোগের গোড়ায় আঘাত হানছি সত্যি কথা, কিন্তু শেকড়শুদ্ধ পুরো রোগগুলোকে নির্মূল করতে গেলে শুধু কোনো একটি বিশেষ প্রক্রিয়া বা বৈজ্ঞানিক বা কারিগরির প্রয়োগই যথেষ্ট নয়। রোগের যেমন বহু কারণ রয়েছে—রোগ নির্মূলের জন্য প্রয়োজন তেমনি সঠিক সম্মিলিত প্রয়োগ পদ্ধতি, যা দাঁড়িয়ে থাকবে সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এখানে দরকার ওই রোগটির নাড়িনক্ষত্র বুঝে নিয়ে পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা চালু করা।'—চতুর্থ প্রচ্ছদের লেখা এই বক্তব্য ডা. জানার বইটির মূল সুর চিনিয়ে দেয়।

ওষুধ পথ্য দিয়েই রোগ সেরে যাবে, রোগের মূল দূর করা যাবে, এইরকম একটা অন্ধবিশ্বাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে----যেন ওষুধ-অপারেশন-হাসপাতাল এই সব প্রযুক্তির উন্নতি হলে, আর সেটা সবার হাতের কাছে পৌঁছে দিলে, রোগ নিয়ে লড়াই জেতা যায়। না, তা যায় না। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-পরিবেশের উন্নতি ছাড়া রোগের মূল দূর করার আশা বৃথা। আবার, এর ঠিক উলটো মেরুর এক মতবাদ জায়গা করে নিচ্ছে কিছু তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবীর কাছে—আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই হল এক প্রাধান্য লাভের জায়গা, বিজ্ঞান একটি আধিপত্যবাদী মতাদর্শ, আর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। এই মতবাদের মানুষেরা কেউ কেউ হোমিওপ্যাথি-হাকিমি-আয়ুর্বেদের মধ্যে, কেউ কেউ তার বাইরে বিজ্ঞান-বিরোধিতার মধ্যে, মানুষের স্বাস্থ্যের উৎস সন্ধান করছেন। স্পষ্টতই, ডা. জানার অন্বেষণ এই দুটো পথের বাইরে। মূলধারার পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দিকটাতে আস্থা রেখেও তিনি বলছেন, এটাই সব নয়। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা, এরা কিছুটা করতে পারে, করেছেও। কিন্তু তার সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, মানুষের স্ব-ক্ষমতার পরিবর্তন না হলে স্বাস্থ্যের যতটা উন্নতি সম্ভব ও কাম্য, ততটা উন্নতি লাভ করা যাবে না। উদাহরণ হিসেবে ব্রিটেনের কথা তুলেছেন তিনি। সেখানে সরকারি উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় সর্ব শ্রেণির মানুষের জন্য উন্মুক্ত। তা সত্ত্বেও সে দেশে ধনী গরিবের রোগভোগ বা মৃত্যু হারের পার্থক্য যথেষ্ট। এক মাস বয়স থেকে একবছর বয়সি শিশুদের মৃত্যুর হার সে দেশে নিম্নতম সামাজিক শ্রেণিতে উচ্চতম শ্রেণির চার-পাঁচগুণ বেশি। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-পরিবেশ-কর্মসংস্থান, এগুলো ঠিকঠাক না থাকলে, কোনো উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা এদের 'বিকল্প' হিসেবে কাজ করতে পারে না। আবার, খাদ্য-বস্ত্র ইত্যাদি ঠিকঠাক থাকলে রোগ কমবে, কিন্তু একেবারে বিদায় নেবে না; তার জন্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজন হবেই। এক কথায়, সামাজিক উন্নতি আর চিকিৎসার উন্নতি, এদের সম্পর্ক বৈরিতামূলক তো নয়ই, বরং মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য এরা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

নিজের রোগ নিজে ঠেকানোর জন্য ব্যক্তির কিছু করণীয় আছে— যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মানা, খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে সচেতন হওয়া, এইসব নানা কিছু। কিন্তু রাষ্ট্র ও অনেক প্রতিষ্ঠান এটার ওপর জোর দিতে গিয়ে এর উলটো পিঠটা দেখান না। পরিবেশে ছড়িয়ে পড়া বিষকে আমরা কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি? আর্সেনিক থেকে ক্যানসার হয়, কিন্তু আর্সেনিক তো আমরা কেউ ইচ্ছে করে খাই না, আর তা আটকানোর উপায় রাষ্ট্রের হাতেই আছে, ব্যক্তি মানুষের হাতে নেই। 'লাইফস্টাইল ডিজিজ' বলে অভিহিত নানা রোগ, যেমন হার্টের রোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ— এগুলোর খানিকটা প্রতিকার (যেমন ধূমপান বন্ধ করা) আমাদের হাতে থাকলেও, অনেকটাই সামাজিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত। ডাক্তারবাবু যতই বলুন না কেন টেনশন করবেন না, যেখানে জীবিকার নিশ্চয়তা নেই, শিক্ষা মানে ইঁদুর-দৌড়, ভবিষ্যৎ আচ্ছন্ন করে আছে অনাগতর আশঙ্কা, সেখানে টেনশন এড়াবেন কোন মন্ত্রবলে? বেশি কথায় কাজ কি, ডাক্তাররা অনেকেই টেনশন, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্ত চাপ, হার্টের রোগ—এসবের শিকার। তাই 'রোগীকে দায়ী করা'-র রাজনীতি থেকেও সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্যশিক্ষা দিয়ে যাঁরা মানুষের স্বাস্থ্যের আমূল বদল আনার কথা ভাবেন, হতাশ হওয়াই তাঁদের ভবিতব্য; তখন তাঁরা ভাবেন, মানুষই বোধকরি নিজের কথা ভাবতে সক্ষম নন। আসলে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে নেশামুক্তি থেকে পরিচ্ছন্নতা বোধ, সব কিছুই অধরা থাকে। আর বাস্তব জীবন না বদলালে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর সম্ভাবনা কম। তাই বস্তিবাসীরা পরিচ্ছন্ন থাকেন না, কিন্তু তাঁদেরই সরকারি এই প্রকল্পের সহায়তায় বস্তি থেকে তুলে পাকাবাড়িতে আনার পর নিজেরাই পরিচ্ছন্ন থাকেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন।

আমাদের মতো দেশে অনেকে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ। আধুনিক, পাশ্চাত্য, বৈজ্ঞানিক, যা এ দেশে 'অ্যালোপ্যাথিক' চিকিৎসা নামে বেশি পরিচিত, সেই চিকিৎসা দুর্লভ ও ব্যয়সাপেক্ষ। সেই অতি-ব্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে ওষুধ কোম্পানি নার্সিংহোম

বেসরকারি হাসপাতাল ল্যাবরেটরি চক্রের, ও ডাক্তারদের সীমাহীন লোভ মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি টলিয়ে দিয়েছে। তাই অনেকে প্রাচীন বা বিকল্প নানা চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে মাতামাতি করছেন। রাষ্ট্রের তরফে এটাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, কেননা এর মাধ্যমে সরকারি চিকিৎসার ব্যয় কমানো যায়, বড়ো ওষুধ কোম্পানির বিরুদ্ধে সাধারণের রোষকে খানিক প্রশমিত করা যায় এই বলে যে সস্তায় ভালো ও ক্ষতিহীন ওষুধ তো রয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করে নিজেকে নিরাপদ রাখা যায়! গ্রামাঞ্চলের মানুষ নাকি এসব ওষুধেই বিশ্বাস রাখেন, আর সেগুলো মানুষের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার, এমনটাও বলা হয়। কথাটার পেছনে কোনো তথ্য বা সমীক্ষা নেই। বিগত শতকের আটের দশকের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা মাত্র তিনজন মানুষ বলেছেন, আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পেলেও তাঁরা প্রাচীন চিকিৎসাই নেবেন। আর শতকরা ৯৭ জন বলেছেন, আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পেলে তাঁরা সেটাই নেবেন। বিকল্প চিকিৎসা নিয়ে ডা. জানার বক্তব্য খুব চাঁচাছোলা। হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক নিযুক্ত করছেন সরকার, আর সহজ লাইসেন্সবিধির সুযোগ রয়েছে ভেষজ ও ভেষজমিশ্রিত ওষুধের ব্যবসায়; চিকিৎসাখাতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দের এক-তৃতীয়াংশ খরচ হবে 'দেশজ চিকিৎসার' প্রসার ও প্রচারে'—এসব জানিয়ে তিনি সরাসরি বিরোধিতা করেছেন সরকারি সিদ্ধান্তের। বিকল্প চিকিৎসা নাকি দামে সস্তা, জনগণের কাছে সহজপ্রাপ্য, জনগণের সংস্কৃতির অঙ্গ, ডাক্তারের জ্ঞানের ওপর একচেটিয়া অধিকারের বিরোধী, বিদেশি প্রযুক্তিনির্ভর নয়, ঘরে ঘরে ওষুধ তৈরি করা যায়, আর নিরাপদ। এই যুক্তিগুলো খণ্ডন করেছেন ডা. জানা। বিকল্প চিকিৎসায় কোনো কোনো রোগী ভালো হতে পারেন। তার কারণ রোগ নিজেই কমে যেতে পারে, আর বৈজ্ঞানিক বা বিকল্প, যেকোনো চিকিৎসার একটা মানসিক দিক আছে, যাকে বলে প্লাসিবো এফেক্ট। কিন্তু বিকল্প চিকিৎসায় কেবলমাত্র সেই সব অসুখ কমে যেগুলো নিজে থেকেই কমতে পারে, আর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় কলেরা, টিবি বা টাইফয়েডের মতো প্রাণঘাতী রোগেও রোগী প্রায় সব ক্ষেত্রেই দিব্যি বেঁচে যায়, সেটা বিকল্প চিকিৎসায় হয় না।

এ ছাড়াও আলোচনা রয়েছে পেশাগত রোগ নিয়ে, ই এস আই-এর চিকিৎসা বিমা নিয়ে (ও তার সঙ্গে সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা-র তুলনা নিয়ে)। ডা. জানার নিজস্ব চর্চার বিষয় এইডস ও অন্যান্য যৌনরোগ নিয়ে, প্রজনন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিয়ে। তাঁর সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত হবার কোনো দরকার নেই, গ্রন্থ-সমালোচক হিসেবে যেটা বলার সেটা হল বক্তব্যের উপস্থাপনার একটা সহজ ভঙ্গি আছে, আর আছে যুক্তি ও প্রমাণকে মেনে চলার প্রবণতা।

এক কথায়, সংগ্রহে রাখার মতো, পড়ে দেখার মতো ও নাড়া দেবার মতো একটি বই। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

Advt.

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬